ভারতের
বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্য

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

ভারতের
বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্য

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ছবি : ইন্দিরা ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

ISBN 81-237-3752-1

প্রথম সংস্করণ : 2002 (*শক* 1923)

Bharater Banyaprani O Abhayaranya *(Bangla)*

মূল্য : 90.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ

শ্রীচরণেষু মা'কে

সূচীপত্র

1. ভূমিকা 1
2. ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 5
3. ভারতের বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য 7
   জীববৈচিত্রে ভারত 9
4. ভারতের বন্যপ্রাণীর পরিচিতি 13
   - বানর ও হনুমান .... 13 - 18
   - উল্লুক ও লরিস .... 18 - 19
   - ভারতীয় বাঘ 20
   - সিংহ 20
   - চিতা বাঘ ও অন্যান্য বিড়াল প্রজাতি .... 21 - 27
   - সিভেট 28
   - স্পটেড লিনসাং .... 28 - 29
   - বেজি .... 29 - 30
   - ভোদ 31
   - হোরি বাম্বু র‍্যাট 31
   - হায়না 32
   - নেকড়ে 33
   - শেয়াল .... 33 - 34
   - ঢোল / বন্য কুকুর 35
   - সজারু 35
   - ভাল্লুক .... 35 - 36

- লাল পান্ডা 37
- বিন্টুরং 37
- বাদুর .... 38 - 40
- চামচিকে 41
- খরগোস .... 41 - 42
- ভোঁদড় 42
- মার্টসেন 43
- হাতি 44
- গন্ডার 45
- বুনো গাধা .... 45 - 46
- গাউর 46
- ইয়াক .... 46 - 47
- বুনো মোষ 47
- ভরাল 47
- মারখোর 48
- হিমালয়ের থর .... 48 - 49
- সেরু 49
- গোরাল .... 49 - 50
- আইবেক্স 50
- কৃষ্ণসার, চিঙ্কারা, চৌশিঙ্গা ও নীলগাই .... 50 - 52
- হাঙ্গুল 53
- সাংগাই বা নাচুনে হরিণ .... 53 - 54
- চিতল হরিণ, সম্বর, কাকার হরিণ,
  পাড়া হরিণ, কস্তুরী হরিণ বারসিঙ্গা .... 54 - 57
- কাঠবিড়ালী .... 57 - 58

5. ভারতীয় জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য........................ 59

- অরুণাচল প্রদেশ 59
- অসম 62

- অন্ধ্রপ্রদেশ 70
- আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 73
- উত্তর প্রদেশ 76
- উত্তরাঞ্চল 78
- ওড়িশা 82
- কর্ণাটক 86
- কেরালা 91
- গোয়া 95
- গুজরাত 96
- জম্মু ও কাশ্মীর 100
- ঝাড়খণ্ড 102
- তামিলনাড়ু 105
- ত্রিপুরা 107
- নাগাল্যান্ড 108
- পশ্চিমবঙ্গ 110
- বিহার 126
- মণিপুর 127
- মিজোরাম 129
- মহারাষ্ট্র 129
- মেঘালয় 132
- মধ্যপ্রদেশ 133
- রাজস্থান 145
- সিকিম 152
- হরিয়ানা 153
- হিমাচল প্রদেশ 154

6. অরণ্য পর্যটকদের কর্তব্য 156

7. গ্রন্থপঞ্জি 157

ভূমিকা

প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত বন ও বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার তটভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এদেশের বনভূমি। ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্রের মতোই বিচিত্র এখানকার বন্যপ্রাণী। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে বন ও বন্যপ্রাণীর প্রভাব অপরিসীম। কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যে আমরা যে বিবরণ পাই, তা মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সখ্যতা ও গভীর মমত্ববোধের কথাই বলে। গৌতম বুদ্ধ. মহাবীর বা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের বাণীতে জীবজগতের উপরে ভালবাসার কথাই বলেছেন। আবার এদেশের জঙ্গলকে নিয়ে লেখা হয়েছে কিপ্‌লিং-এর 'জাঙ্গল বুক' বা জিম করবেটের 'ম্যান ইটার্স অব কুমায়ুন' ও 'জাঙ্গাল লোর'-এর মতো কালজয়ী সাহিত্য। মানুষ যখন বনে থাকত, তখন বন্যপ্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাকে খাবার জোগাড় করতে হত। খাদ্যের তাগিদে তাকে বন্যপ্রাণী হত্যা করতে হত। মানুষ তখন অকারণে বন্যপ্রাণী হত্যা করত না। সেইজন্যে সেই সময় বন বা বন্যপ্রাণীর কোনও ক্ষতি হত না। সভ্যতা যতই এগোতে লাগল, বন ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল অনেক বন্যপ্রাণী।

আমাদের দেশে শিকার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার অথবা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিকারের কথা আমরা ইতিহাসে পাই। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জাকজমকপূর্ণ শিকার অভিযানের বিবরণও সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমাদের দেশে বন ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস বেশি দিন আরম্ভ হয়নি। আমাদের দেশীয় রাজা ও বিশেষত ব্রিটিশ শাসকদের সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় নির্বিচার

বন্যপ্রাণী হত্যালীলা। এইসব রাজা-রাজরাদের মধ্যে নাম করা যায়, সরগুজার মহারাজা, পাতিয়ালার মাহরাজা প্রমুখদের। অবিবেচক এই হত্যালীলার ফলস্বরূপ ভারতের জঙ্গল থেকে হারিয়ে গেছে ভারতীয় চিতা, জাভান গন্ডার, গোলাপী মাথার হাঁস, পাহাড়ী বটের আরো কত কী! সংকটময় অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্লো ও স্লেন্ডার লরিস, লাল পান্ডা, মণিপুরের নাচুনে হরিণ, বড়শিঙ্গা হরিণ, কাশ্মীরের হাঙ্গুল, বনরুই, হুকনা, সাইবেরিয়ার সারস প্রভৃতি অজস্র প্রাণী। নির্বিচার হত্যার ফলে এক সময় ভারতীয় এক শৃঙ্গী গন্ডারও অস্তিত্ব হারাতে বসেছিল। উত্তর ভারতে এক সময় অনেক জায়গাতেই সিংহের সন্ধান মিলত; সেই সিংহের অস্তিত্বও সংকটময় জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। এখন এক গুজরাট রাজ্য ছাড়া আর কোথাও সিংহ পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে অসংখ্য বাঘ ছিল এবং প্রায় সব জঙ্গলেই বাঘের সন্ধান মিলত। 1972 সালের আদমসুমারিতে বাঘের সংখ্যা দাড়িয়েছিল 1700-এর কাছাকাছি। তবে, রাজা-মহারাজারা, কিছু কিছু জঙ্গলকে তাঁদের নিজস্ব শিকারভূমি হিসেবে সংরক্ষিত করেছিলেন। ফলে সেখানে যে খুশি গিয়ে শিকার করতে পারত না। পরবর্তী কালে শিকার নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর ওই সংরক্ষিত বনগুলিই হয়ে ওঠে বন্যপ্রাণীর প্রকৃত আশ্রয়স্থল। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় সিমলিপাল, বান্ধবগড় বা রন্থাম্ভোর ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলি। এইভাবেই আমরা দেখতে পাই বহু ইংরাজ শিকারি ও দেশীয় মহারাজা পরবর্তীকালে সংরক্ষণের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। 1972 সালে ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন প্রণয়নের পর অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এখন শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রায় সমস্ত বন্যপ্রাণীর সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় বাঘের সংখ্যা প্রায় 4000-এর কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

একটা সময় ছিল, মানুষ যখন শুধুমাত্র শিকার করতেই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। আর ভ্রমণ পিয়াসীরা যাঁরা প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন, তাঁরা ছুটতেন পাহাড়ে নয়তো সমুদ্রে। সময় বদলেছে। বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিভিন্ন

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও) আর ন্যাশানাল জিওগ্রাফি, অ্যানিমাল প্ল্যানেট, ডিসকভারি প্রভৃতি দূরদর্শন চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষ এখন বন্যপ্রাণীর বিষয়ে সচেতন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যাপারেও মানুষ যথেষ্ট উৎসাহী। তাই বনভ্রমণের জনপ্রিয়তার কারণে মানুষ আজ অরণ্য পর্যটক। এখন শহুরে-জীবনে ক্লান্ত মানুষ একটু নির্জনতার টানে, একটু বিশুদ্ধ অক্সিজেনের খোঁজে জঙ্গলে ছোটে।

প্রত্যেক জঙ্গলেরই একটা নিজস্বতা আছে। সুন্দরবনের হেঁতাল, বাইন আর ক্যাওড়ার জঙ্গলে নদীপথে বেড়াবার যে স্বাদ, তার থেকে অনেক ভিন্নতর স্বাদ শাল-মহুয়ায় ঘেরা পালামৌ বা সিমলিপালের বনভূমিতে। আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের নামডাফার চিরহরিৎ জঙ্গলের থেকে রাজস্থানের রনথম্ভোরের অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যরকম। আরো বড় পরিধিতে দেখতে গেলে ভারতের জঙ্গল, আফ্রিকার বনভূমি আর আমাজনের অরণ্যের মধ্যে চরিত্রগত অনেক তফাত।

আবার জঙ্গলভেদে বন্যপ্রাণীর মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়। কোথাও দ্রষ্টব্য বাঘ, কোথাও সিংহ, কোথাও নাচুনে হরিণ আর কোথাওবা তুষারচিতা। সেইজন্য বনভ্রমণ নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য আর খোলা জঙ্গল। তাই ভ্রমণ মানচিত্রে বনভূমি আমাদের দেশে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। শুধু প্রয়োজন ভালোবাসা দিয়ে জঙ্গলগুলি বাঁচিয়ে রাখা, উদ্দেশ্য যাতে সংরক্ষিত হয় বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলি।

এই বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভারতীয় স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও বাঘ্র প্রকল্পগুলিও আলোচিত হয়েছে। যে সমস্ত পশুপাখির প্রচলিত বাংলা নাম পাওয়া যায়, সেই নামগুলি যথাসম্ভব ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বইটি প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয়। বইটি লেখার সময় যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন ইন্দিরা ভট্টাচার্য। অনুপ্রেরণা

যুগিয়েছেন বুড়োশিব দাশগুপ্ত। সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেছেন অরুণ চক্রবর্তী মহাশয়। এদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আশা রাখি ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, এই বইটি তাঁদের আগ্রহী মনকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।

—*বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী*

1

ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

আমাদের দেশে লিখিতভাবে প্রথম বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়েছিল সম্রাট অশোকের সময়। এই আইন অনুসারে টিয়া, ময়না, লাল রাজহাঁস, নান্দীমুখ, ক্রৌঞ্চ, বাদুড়, স্ত্রী পিঁপড়ে, ছোট কচ্ছপ, কাঁটাবিহীন মাছ, গন্ডার এবং যে সমস্ত চতুষ্পদী প্রাণী মানুষের খাদ্য নয় বা কাজের অযোগ্য, তাদের হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আইনে জঙ্গল নষ্ট করা ও জ্বালানোর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। সম্রাট অশোকের এই ঘোষণার পর বহুদিন পর্যন্ত কোনও বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর বহুপরে বিশেষ কিছু প্রাণী সংরক্ষণ করবার জন্য কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যেমন, 1879 সালের হস্তিসংরক্ষণ আইন। ওই একই সময় রাজ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ ও আইন তৈরি হয়ছিল — অসমে ও মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই)। কিন্তু প্রথম সর্বভারতীয় বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয় 1887 খ্রিস্টাব্দে। আইনটির নাম ছিল 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন'। 1912 খ্রিস্টাব্দে আইনটি সংশোধন করে এর ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়। নতুন আইনটির নাম হয় — 'বন্যপ্রাণী ও বন্যপক্ষী সংরক্ষণ আইন'। এই আইনে অমান্যকারীদের জন্যে জরিমানা, এমনকী জেলের ব্যবস্থাও ছিল। তবুও এই আইনের অনেক ফাঁক থাকায়, আইন অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 1935 সালে আবার আইনটির পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এই আইনটিও বন সংরক্ষণের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। অবশেষে প্রণীত হয় 1972 সালে 'ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন'। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকবার আইনটির সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এই আইনে সর্বপ্রথম আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি বা নন গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশান (এন জি ও)- যারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে লিপ্ত তাদেরও কোর্টের সাহায্য নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ভারতের মাটিতে পাতিকাক, বাদুড়, নেংটি ইঁদুর ও বড় ইঁদুর ছাড়া কোনও রকমের বন্যপ্রাণী হত্যা করা পোষা বা তাদের কোনও অংশ নিয়ে ব্যাবসা করা আইনত দণ্ডনীয়। বন্যপ্রাণীদের গুরুত্ব অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি তফসিলে ভাগ করা হয়েছে। এই তফসিল অনুযায়ী আইনভঙ্গকারীদের শাস্তির প্রকারভেদ আছে।

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাবার একটা বড় কারণ হল, বন্যপ্রাণী ও তাদের দেহজ অংশ নিয়ে ব্যবসা। আন্তর্জাতিক বাজারে এই ব্যবসা বেশ রমরমা হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে এই ব্যবসা বন্ধ করতে 1975 সালের পয়লা জুলাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির নাম "Convention on International Trade in Endanger Species" (CITES); ভারত প্রথম থেকেই এই CITES সংস্থার সদস্য।

সমস্ত জীবসম্পদ ও তাদের জিনগত বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্যে বেশ কয়েকটি বনাঞ্চলকে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। সংরক্ষিত বনভূমি বা জলসম্পদের অংশ ছাড়া, যেকোনও জঙ্গলকে রাজ্য সরকার নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অভয়ারণ্য বলে ঘোষণা করতে পারেন, অবশ্য যদি সেই অঞ্চলের বস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ, ভূ-পৃষ্ঠ ও প্রকৃতি, সেই অঞ্চলের বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা, সংখ্যাবৃদ্ধি ও তার পরিবেশ বিকাশের জন্যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে, অভয়ারণ্যের ভেতরে অথবা বাইরে, যদি সেই অঞ্চলের বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা, সংখ্যাবৃদ্ধি ও তার পরিবেশ বিকাশের জন্যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়, তাহলে রাজ্য সরকার নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সেই অঞ্চলকে 'জাতীয় উদ্যান' বলে ঘোষণা করতে পারেন। ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, 1972 অনুযায়ী জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অভয়ারণ্য থেকে অনেক বেশি কঠোর করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী জাতীয় উদ্যান ও অভয়রাণ্যের উভয়ক্ষেত্রেই আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

বর্তমান ও ভবিষ্যতে গবেষণা ও শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় জীবপরিমণ্ডলের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রসংঘের 'ইউনেস্কো' বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু অঞ্চলকে 'সংরক্ষিত জীবপরিমণ্ডল অঞ্চল' বা Biosphere Reserve ঘোষণা করেছেন।

1972 সালে বাঘ সুমারির পর বাঘের সংখ্যা দেখে সারা বিশ্বের সংরক্ষণবাদীরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (W.W.F) বাঘ বাঁচাবার তাগিদে এক তহবিল গঠন করে। স্কুলের ছাত্ররা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সেই তহবিলে দান করে। যত অর্থ আশা করা গিয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল ওই তহবিলের জন্যে। এই তহবিলের অনুদানকে প্রাথমিক অর্থ হিসাবে ব্যবহার করে দেশে ব্যাঘ্র প্রকল্পের (Tiger Project) সূচনা হয় 1973 সালে। খরচের সিংহভাগ বহন করে ভারত সরকার। ব্যাঘ্র প্রকল্প স্থাপনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান অনস্বীকার্য। এ পর্যন্ত 25 টি অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আমাদের দেশের মোট 32,87,263 বর্গকিলোমিটার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 7,51,846 বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বনভূমি। অর্থাৎ মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের মাত্র 22·8 শতাংশ অঞ্চল বনভূমি। দেশের জনসংখ্যা এই মুহূর্তে যদি একশো' কোটি হয়, তাহলে মাথাপিছু জঙ্গল রয়েছে মাত্র 0·1 হেক্টর। অথচ মাথাপিছু বনাঞ্চলের প্রয়োজন 0·8 হেক্টর। প্রয়োজনের চাইতে এই পরিমাণ অবশ্যই অনেক অনেক কম।

2

ভারতের বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য

প্রাণী বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে হিমালয় পর্বতের একটি বিশেষ স্থান আছে। উত্তর-পূর্ব থেকে আরম্ভ করে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত, অর্থাৎ সমস্ত উত্তরভাগ জুড়ে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। উচ্চতম তুষারাবৃত হিমালয়, যার নাম হিমাদ্রী থেকে ক্রমে নীচের দিকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে পশ্চিমে গাড়োয়াল, কুমায়ুন, পূর্বে পাটকৈ, তারপর পশ্চিমের শিবালিক আর সব থেকে নীচে আছে ভাবর আর তরাই। হিমালয়ের পর গাঙ্গেয় সমতল, তার দক্ষিণে রয়েছে মধ্যভারতের মালভূমি, এরপর দক্ষিণভারতের মালভূমি ও সমতল। জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ভারতকে আরো কয়েকটি ভৌগলিক অবস্থানে ভাগ করা যায়। ভারতের তিনদিকে সমুদ্র; সুতরাং সামুদ্রিক আবহাওয়ারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। এছাড়া আছে উত্তর-পশ্চিমে রাজস্থানের প্রায় মরু ও মরু অঞ্চল। সবদিক বিবেচনা করলে বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে ভারতকে সাত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(1) উত্তর-পূর্ব হিমালয় (2) গাঙ্গেয় সমতল (3) মধ্যভারতের মালভূমি (4) পশ্চিম হিমালয় (5) দক্ষিণভারত (6) সামুদ্রিক ও (7) মরু অঞ্চল।

এই সাতটি অঞ্চলের প্রায় সবগুলিতেই এমন কিছু বন্যপ্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, যা অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে দেখা যায় না। আবার বেশ কিছু প্রাণী আছে যেগুলি সমস্ত অঞ্চলগুলিতেই দেখতে পাওয়া যায়।

1. উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের বনভূমি : উত্তরবঙ্গ থেকে আরম্ভ করে অসম, সিকিম, মনিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মিজোবাম রাজ্যের অবস্থান এই অঞ্চলজুড়ে। বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্যেও এ অঞ্চলের জুড়ি নেই। বেশ কিছু প্রাণী আছে যা শুধু উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের জঙ্গলেই পাওয়া যায়। যেমন, হরিণ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে মণিপুরের সাংগাই, ভারতের একমাত্র বন্যমানুষ জাতীয় প্রাণী (Ape) উল্লুকের খোঁজ মেলে উত্তর-পূর্বের নানান জায়গায়। ভাম (সিবেট) জাতীয় প্রাণী, স্পটেড লিংস্যাং, বিরল বেড়াল প্রজাতির প্রাণী আমচিতা, সোনালী বেড়াল, মার্বেল্ড ক্যাট, শুকর পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য বামন বরাহ (পিগমি হগ), বানর পরিবারে অসমীয়া বানর (অ্যাসামিজ ম্যাকাক), সোনালী

হনুমান (গোল্ডেন লাঙ্গুর), ক্যাপড হনুমান (ক্যপড লাঙ্গুর), চশমা বানর (স্পেকট্যাকল মানকি), গভার লজ্জাবতী বানর (স্লোনরিস) প্রভৃতি আরো অনেক প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের জঙ্গলে। এছাড়া রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, চিতাবেড়াল, বনবেড়াল, হাতি, গাউর, বনশুয়োর, ছাগল জাতীয় প্রাণী গোরাল, সেরু, টাকিন প্রভৃতি প্রাণী।

2. গাঙ্গেয় সমতলের বনাঞ্চল : এই অঞ্চলের অন্তর্গত রয়েছে পশ্চিমবাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের অংশবিশেষ। বিহার রাজ্যের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে ছোটনাগপুরের মালভূমি। এই অঞ্চলের বনভূমিতে একেবারে নিজস্ব (endemic) কোন বন্যপ্রাণী নেই বললেই চলে। তবে এই সব জঙ্গলে রয়েছে হাতি, বাঘ, গাউর, চিতল হরিণ, কাকার হরিণ (বার্কিং ডিয়ার) প্রভৃতি প্রাণীর প্রাচুর্য্য।

3. মধ্যভারতের মালভূমি : পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট ও সাতপুরা পর্বতমালা মালভূমি সমৃদ্ধ মধ্যভারত ভরে আছে গভীর বনভূমিতে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ নিয়েই প্রধানত গঠিত এই অঞ্চল। এখানকার বনভূমি ভরে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, চিতাবেড়াল, বনবেড়াল, মেছোবেড়াল, চিতল, কাকার, বারশিঙ্গা, কৃষ্ণসার প্রভৃতি হরিণ, নীলগাই, গাউর, বুনো মোষ, প্রভৃতি প্রাণীতে। এই অঞ্চলের নিজস্ব প্রাণী (endemic) শক্তজমির বারশিঙ্গা (হার্ড গ্রাউন্ড বারা সিঙ্গা) হরিণ।

4. পশ্চিম হিমালয় : উত্তরাঞ্চল, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ নিয়ে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলের নিজস্ব প্রাণী (endemic) বলতে রয়েছে কাশ্মীরি হরিণ — হাঙ্গুল, হিমালয়ের বাদামী ভাল্লুক, তিব্বতী বুনো গাধা — ক্যায়াং, তিব্বতী নেকড়ে প্রভৃতি। এছাড়া এই অঞ্চলে আছে তুষারচিতা, হাতি, বাঘ, গাউর, সেরু, গোরাল, কস্তুরী হরিণ (মোস্ক ডিয়ার) প্রভৃতি বন্যপ্রাণী।

5. দক্ষিণভারতের বনাঞ্চল : দক্ষিণভারতের জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে পশ্চিমঘাট পর্বত ও নীলগিরি পর্বত। এই দুই পর্বতমালা ভরে আছে গভীর জঙ্গলে। নীলগিরিতে ঘাসের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে (শোলা বনভূমি), সেখানেও আছে নিজস্ব (endemic) বন্যপ্রাণী, যেমন নীলগিরি থর। দক্ষিণভারতের বনাঞ্চলে বলতে যে সমস্ত রাজ্যকে ধরা হচ্ছে সেগুলি হল— অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরল। এইসব রাজ্যের জঙ্গলে এমন অনেক নিজস্ব (endemic) প্রাণী আছে যা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এইসব নিজস্ব প্রাণীর মধ্যে আছে নীলগিরি হনুমান, সিংহপুচ্ছ বানর (লায়ন টেলড ম্যাকাক্), বনেট বানর, ভারতীয় বড় কাঠবেড়ালী (মালাবার স্কুইরেল) প্রভৃতি। এছাড়া দক্ষিণভারতের অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, গাউর, বুনো শুয়োর প্রভৃতি।

6. সামুদ্রিক বনাঞ্চল : ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে কয়েক রকমের বিশেষ বিশেষ বনভূমির সন্ধান মেলে। পূর্ব উপকূলের সুন্দরবনে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যাংগ্রোভ

জাতীয় বনভূমি। এই জাতীয় বনভূমির গাছগুলির শিকড় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকে। এদের বলে নিউমাটোফোর (Pneumatophor) বা শুলো। আবার আরেক রকম ম্যাংগ্রোভ এখানে পাওয়া যায় যাদের গুচ্ছমূল বা ঠেসমূল (স্টিলট রুট) থাকে। এই অঞ্চলে রয়েছে ভারতবর্ষের জঙ্গলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বাঘ। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক কারণে এদের মধ্যে কিছু বাঘ মানুষখেকো। এরা এদেশের অন্যান্য জঙ্গলের মত একই প্রজাতির বাঘ হলেও ধূর্ততায় এদের জুড়ি নেই। এই অঞ্চলের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্য গুজরাটে রয়েছে দুটি বিশেষ প্রাণী, যারা এ অঞ্চলের একেবারেই নিজস্ব (endemic)। এরা হল -- এশিয়ার সিংহ এবং ভারতীয় বুনো গাধা।

7. মরু অঞ্চলের বনভূমি : এই অঞ্চলের রাজ্যটি হল — রাজস্থান। ভারতের একমাত্র মরুভূমি থর এই রাজ্যে অবস্থিত। রাজস্থানের অন্যান্য বনাঞ্চলগুলিও মরুপ্রায়— কাঁটাগাছের জঙ্গল। এই অঞ্চলের নিজস্ব (endeimc) প্রাণী মরুভূমির শেয়াল ও মরুভূমির বেড়াল প্রভৃতি প্রাণী আছে। কিন্তু অন্যান্য বন্যপ্রাণীতে ভরে আছে এদেশের মরু ও মরুপ্রায় বনভূমিগুলি। এইসব বন্যপ্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘ, চিতাবাঘ, নীলগাই, সম্বর, চিঙ্কারা, কৃষ্ণসার হরিণ প্রভৃতি।

জীব-বৈচিত্রে ভারত

বন্যপ্রাণীর সংখ্যায় হয়তো আফ্রিকা এগিয়ে, কিন্তু জীব বৈচিত্রের দিক থেকে ভারত অনেক সমৃদ্ধ। এ দেশে আছে প্রায় 15,000 প্রজাতির গাছপালা, 500 প্রজাতির স্তন্যপায়ী, 1230 প্রজাতির পাখি, 246 প্রজাতির সাপ, 142 প্রজাতির উভচর প্রাণী, 105 প্রজাতির মিষ্টিজলের মাছ, 3 প্রজাতির কুমীর, 31 প্রজাতির কচ্ছপ, আর অসংখ্য প্রজাতির কীটপতঙ্গ, যার মধ্যে রয়েছে বর্ণময় প্রজাপতিরা।

তবু ভারতে আজ অনেক প্রজাতিই বিপন্ন। 19 টি বানরের (Primate)-এর মধ্যে 12 টিই বিপন্ন। বিশ্বের অন্যতম বিপন্নতম বানর হল দক্ষিণভারতের 'সিংহপুচ্ছ বানর'। অন্যান্য বিপন্ন বানরেরা হল— পিগটেল, হ্রস্বপুচ্ছ (স্টামপ টেইল ম্যাকাক্) এবং অসমীয়া বানর। এই তিন প্রজাতিকে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বনভূমিতে। আবার কাঁকড়াভুক বানরও বেশ বিরল হয়ে পড়েছে। অসমের সোনালী ও ক্যাপড হনুমান আর ত্রিপুরার চশমা বানর সবাই আছে বিপন্ন প্রাণীর তালিকায়। বিপন্ন নয় এমন বানরের মধ্যে রয়েছে— সাধারণ হনুমান, নীলগিরি হনুমান, সাধারণ ও বনেট বানর। এদেশের একমাত্র বনমানুষ গোত্রীয় প্রাণী (Ape)-হল হুলক গিবন। উত্তর-পূর্ব ভারতের গভীর জঙ্গলে এদের দেখা মেলে। পোষার জন্যে প্রধানত এদের ধরা হয়। পাহাড়ি আদিবাসীদের কাছে এদের মাংসও প্রিয়। বন ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই বৃক্ষবাসী হুলক গিবন আজ বিপন্ন।

এ দেশে দুই প্রজাতির পিঁপিলিকা-ভুক জাতীয় প্রাণী বনরুই (প্যাঙ্গোলিন) পাওয়া যায়। এরা হল চীনা বনরুই ও ভারতীয় বনরুই। উত্তর-পূর্ব ভারতের গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা স্লো লরিস আর দক্ষিণভারতের স্লেন্ডার লরিস বা লজ্জাবতী বানর — দুটি লরিসই বিপন্ন।

মাংসাসী প্রাণীদের মধ্যে ভল্লুক (URISIDAE) পরিবারের অন্তর্গত শ্লথ ভল্লুক ছাড়া হিমালয়ের বাদামী ভল্লুক, হিমালয়ের কালো ভল্লুক ও মালয়ের সান ভল্লুক — এই তিনটি প্রজাতিই বিপন্ন প্রাণীর তালিকায় আছে। পান্ডা (PROCYONIDAE) পরিবারের একমাত্র প্রাণী লাল পান্ডা, যা নেপাল হিমালয় থেকে অরুণাচল পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের অস্তিত্বও এখন বিপন্ন।

ভোঁদড় (MUSTELIDAE)-পরিবারের প্রায় সমস্ত সদস্যই বিপন্ন। সাধারণ ভোঁদড় পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র। স্মুথ ইন্ডিয়ান ভোঁদড় ভারতে সর্বত্রই দেখা যায়। ক্ললেস ভোঁদড় — কুস, নীলগিরি ও পালানি পাহাড় ছাড়া সর্বত্র পাওয়া যায়। মারটেন-এর সন্ধান মেলে কাশ্মীর, হিমালয় অঞ্চলে। হিমালয়ান্ উইজেল দেখা যায় একমাত্র হিমালয়ে। ফেরেট ব্যাজার পাওয়া যায় আসামে। হগ্ ব্যাজার-এর সন্ধান মেলে অরুণাচল, অসম ও পূর্ব হিমালয়ে। ভাম (VIVERRIDAE) পরিবারের 15টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় ভারতে। এর মধ্যে সবচাইতে বিপন্ন প্রাণী হল স্পটেড্ লিংস্যাং। সিকিম, অরুণাচল ও আসামে এদের সন্ধান মেলে। অন্যানদের মধ্যে বড় ভারতীয় ভাম, যাদের দেখা পাওয়া যায় সিকিম, উত্তরবঙ্গ, অরুণাচল, মেঘালয় ও অসমে। এছাড়া ছোট ভারতীয় ভাম ও সাধারণ ভাম প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। হিমালয়ের ভাম, আর বিন্টুরঙ্গ-এর দেখা পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে। বিন্টুরঙ্গের অস্তিত্ব সংকটময়। যাদের সম্বন্ধে আলোচিত হল এদের সবার অস্তিতই বিপন্ন।

15 সদস্যের বিড়াল (FELIDAE) পরিবারের এক বন বিড়াল বাদ দিলে, সবাই বিপন্ন প্রাণীর তালিকায়। বাঘ, সিংহ, সোনালী বিড়াল, তুষার চিতা, চিতা বাঘ, আম চিতা, ক্যারাকল, চিতা বিড়াল, রাস্টি স্পটেডক্যাট, মরু বিড়াল, প্যাল্লাসেস ক্যাট, লিঙ্কস, মার্বেলড ক্যাট — এরা সবাই কমবেশি বিপন্ন।

ভারতের প্রায় সব জঙ্গলেই ডোরাকাটা হায়েনা দেখা যায়। এখন এদের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে, বিশেষত এদের বাসস্থান কমে যাবার জন্যে।

ভারতে গন্ডার (RHINOCEROTIDAE) পরিবারের একমাত্র সদস্য এক শৃঙ্গী গন্ডার। প্রধানত নাকের উপরকার খড়্গোর জন্যে এদের হত্যা করা হয়। এর ফলস্বরূপ 1904 সালে কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে এদের সংখ্যা 12-তে নেমে আসে। নিবিড় সংরক্ষণের ফলে বর্তমানে এদের মোট সংখ্যা প্রায় 1200; এছাড়াও এদেশে আরো দুই প্রজাতির গন্ডার ছিল — জাভার গন্ডার আর এশিয়ার দুই শৃঙ্গী গন্ডার। এই দুই প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল আগে।

গাধা (EQUIDAE) পরিবারের দুই প্রজাতিকে আমাদের দেশে দেখা যায় — এশিয়ার বুনো গাধা; এদের খোঁজ মেলে কচ্ছের রান অঞ্চলে। আরেক প্রজাতি তিব্বতের বুনো গাধার' সন্ধান মেলে লাডাকে। এই দুই প্রজাতিও বিপন্ন।

ভারতবর্ষের আরেক বড় পরিবার হল হরিণ (CERVIDAE)। সবচেয়ে সাধারণ হরিণ যা উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া আমরা প্রায় সমস্ত জঙ্গলেই দেখতে পাই, তা হল চিতল। এরাই এদেশে বড় মাংসাশী প্রাণীদের প্রধান খাদ্য। চিতল ছাড়া ভারতের অন্যতম সাধারণ হরিণ হল সম্বর। এরাও প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে । কাশ্মীরের হাঙ্গুল হরিণের কিন্তু বেশ বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এদের আনুমানিক সংখ্যা 300। মনিপুরের কাইবুল লামজাও হ্রদ-এ পাওয়া যায় সাংগাই বা নাচুনে হরিণ। এদের সংখ্যা একশোরও অনেক নীচে। বারশিঙ্গা হরিণের দুইটি-উপপ্রজাতি — শক্ত জমির বারাশিঙ্গা (হার্ড গ্রাউন্ড বারাসিঙ্গা) এবং জলা জমির বারাশিঙ্গা (সফট গ্রাউন্ড বারাসিঙ্গা)। প্রথমটি পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশে কানহায়। 1978 সালে এদের সংখ্যা 80-তে নেমে গিয়েছিল। বর্তমানে এরা সংখ্যায় বেশ বাড়লেও, এখনো বিপদসীমার বাইরে নয়। দ্বিতীয়টির সন্ধান মেলে অসমের কাজিরাঙ্গায় আর উত্তরপ্রদেশের দুধুয়া জাতীয় উদ্যানে। এদের পরিস্থিতি শক্তজমির বারশিঙ্গাদের মত অতটা খারাপ নয়। পাড়া হরিণ (হগ ডিয়ার)-এর দেখা পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে আর উত্তরভারতের তরাই অঞ্চলে। কাকার হরিণ — আছে ভারতের প্রায় সব জঙ্গলেই। আরেক বিপন্ন হরিণ কস্তুরী মৃগ। সুগন্ধি কস্তুরির জন্যে এদের হত্যা করা হয়। মধ্যভারতে একসময় এদের দেখা যেত। এখন দেখাই পাওয়া যায় না। উত্তর-পূর্ব ভারত ও হিমাচল প্রদেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের সবচেয়ে ছোট প্রজাতির হরিণ মাউস ডিয়ার। প্রধানত দক্ষিণভারতেই দেখতে পাওয়া যায় এই বিপন্ন প্রজাতিটিকে।

শূকর (SUIDAE) পরিবারের এদেশের সবচেয়ে পরিচিত সদস্য ভারতীয় বুনো শূকর বাকি প্রজাতিগুলি বিপন্ন। একটি হল অসমের পিগমি হগ আরেকটি আন্দামানের বুনো শূকর।

গবাদি জাতীয় (BOVIDAE) পরিবারের অ্যান্টিলোপ উপবিভাগে এদেশের সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতিটি নীলগাই। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে দেখা যায় সবচেয়ে ছোট অ্যান্টিলোপ — চিঙ্কারা। হিমালয়ের তিব্বতের কাছাকাছি দেখা যায় চিরু। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণভারতের জঙ্গলে কৃষ্ণসার দেখাতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় এরা নীলগাই-এর পরেই। চৌশিঙ্গা-র সন্ধান পাওয়া যায় হিমালয়ের দক্ষিণে। চিরু ও চৌশিঙ্গা বিপন্ন প্রাণীর আওতায় পড়ে। BOVIDAE পরিবারের আরেক উপবিভাগ ছাগল ও ভেঁড়া (গোট অ্যান্টিলোপ)। এই উপবিভাগের সেরু, গোরাল ও টাকিন-এরা সবাই হিমালয়ের বিভিন্ন দিকের বাসিন্দা। লাডাকে আর গিলগিটে সন্ধান পাওয়া যায় বুনো ভেড়া শাপু-র। লাডাকে ও সিকিমের আরেক রকমের বুনো ভেড়া — নয়ান। এই দুই প্রজাতিই আজ ভীষণভাবে

বিপন্ন। যদিও মুখ্যত তিব্বতি বন্যপ্রাণী, তবুও ভরাল-এর সন্ধান পাওয়া যাবে লাডাক, কুমায়ুন, হিমালয় আর সিকিমে। পশ্চিম হিমালয়ের কুমায়ুনের অনেক উচ্চতায় রয়েছে আরেক ধরনের পাহাড়ি ছাগল, আইবেক্স। হিন্দুকুশ পর্বত ও কাশ্মীরেব পশ্চিমদিক থেকে হিমালয় পর্যন্ত সুন্দর এক প্রজাতির ছাগল দেখা যায়। এরা মারখোর। দু-ধরনের থর-এর সন্ধান পাওয়া যায় এদেশে। যারা হিমালয়ে থাকে তারা হিমালয়ান থর ও যারা দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি অঞ্চলে থাকে তারা নীলগিরি থর। এরা সবাই কম বেশি বিপন্ন। Bovidae পরিবারের সবচেয়ে বড় উপবিভাগটি — ষাঁড় (Ox)। এদেশের প্রায় সর্বত্রই গাউর পাওয়া যায়। ব্যানটেং বা বার্মার বন্য ষাঁড়ের সন্ধান পাওয়া যেত মনিপুরে। তবে এখন এদেশে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। প্রধানত লাডাকে দেখা যায় চমরিগাই। এক সময় এদেশের বহু জঙ্গলে বুনো মোষ দেখা যেত। কিন্তু এখন অসম ও মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এদের পাওয়া যায়। এদের অস্তিত্বও বিপন্ন।

এদেশে হস্তি (Proboscidae) পরিবারের একমাত্র সদস্য ভারতীয় হাতিদের দেখা পাওয়া যায় পশ্চিমভারতের সমুদ্র উপকুলবর্তী ম্যানগ্রোভ ও উচুঁপর্বত ছাড়া প্রায় সর্বত্রই।

এছাড়া ভারতবর্ষে পাওয়া যায় পাঁচ প্রজাতির বেজি। এরা হল — সাধারণ বেজি, ছোট ভারতীয় বেজি, স্ট্রাইপড্‌নেকড বেজি, কাঁকড়া ভুক বেজি ও বাদামী বেজি। এদের মধ্যে কাঁকড়া ভুক বেজি বিপন্ন প্রাণী।

কুকুর (Canidae) পরিবারের পাঁচটি প্রজাতি রয়েছে ভারতে। এরা হল ভারতীয় নেকড়ে, তিব্বতি নেকড়ে, পাতি শেয়াল, খ্যাঁক শেয়াল আর বুনো কুকুর। এই সবকটি প্রজাতিই আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

বাদুড় (Chiroptera) পরিবারের এগারোটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় আমাদের দেশে। সবচেয়ে সাধারণ দুটি সাধারণ বাদুড় ও চামচিকে। এছাড়াও আরও অনেক বাদুর আছে তারা হলো — ফালভাস ফ্রুট-ব্যাট, সর্টনোজড ব্যাট, ইন্ডিয়ান ফলস ভ্যামপায়ার, বিয়ার্ডেড শিথ-টেলড ব্যাট, গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্সসু ব্যাট, সেরোটাইন, টিকলস ব্যাট, কমন ইয়েলো ব্যাট, ও পেইন্টেড ব্যাট।

ইঁদুর ও কাঠবেড়ালি (Rodentia) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগুলি হল কাঠবেড়ালি, মারমট ইঁদুর ও নেংটি ইঁদুর। কাঠবেড়ালির মধ্যে এদেশে সন্ধান মেলে তিন রকমের বড় কাঠবেড়ালির। এরা হল, মালাবার বড় কাঠবেড়ালি, মালয়ের বড় কাঠবেড়ালি ও গ্রিজেল্ড কাঠবেড়ালি। প্রথমটি পাওয়া যায় প্রধানত দক্ষিণ ভারতে, দ্বিতীয়টি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ও তৃতীয়টির হিমালয়ে দেখা পাওয়া যায়। এছাড়া আছে তিন দাগ ও পাঁচ দাগ বিশিষ্ট কাঠবেড়ালি এবং ছাই রঙা কাঠবেড়ালি (Hoarybellied Squrell)। কয়েক প্রজাতির উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি বা ফ্লাইং স্কুইরেল এর সন্ধান পাওয়া যায় ভারতে। এরা হল ফ্লাইং স্কুরেল কাশ্মীর উলি ফ্লাইং স্কুইরেল, কমন জ্যায়ান্ট ফ্লাইং স্কুইরেল, রেড ফ্লাইং স্কুইরেল, বড় ময়ূরী, ফ্লাইং স্কুইরেল, হেয়ারিফুটেড প্রভৃতি।

ভারতের বন্যপ্রাণীর পরিচিতি

সাধারণ বানর

THE RHESUS MONKEY (*Macaca mulatta*)

আকৃতি : দেখতে মোটাসোটা এই বানরটি উচ্চতায় 60 থেকে 65 সে.মি.। গায়ের রং পাটের মতো। কোনও কোনওটির মুখ ও পেছন দিক লাল। এদের ওজন 8/10 কিলোগ্রাম। স্ত্রী বানর সামান্য হাল্কা।

বাসস্থান : দক্ষিণভারত ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা মেলে। হিমালয়ে 8000 ফুট উচ্চতায় পাইনের জঙ্গলেও এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : কচি চারা গাছ, লতাপাতা, মাকড়সা ইত্যাদি।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

অসমীয়া বানর

THE ASSAMESE MACAQUE (*Macaca assamensis*)

আকৃতি : অনেকটা সাধারণ বানরের মতো দেখতে। তবে এদের মুখ ও পেছনদিক কখনওই সাধারণ বানরের মতো লাল হয় না। বয়স্ক পুরুষদের গলার

দিকটা বেশ ভারী। মাপে এরা সাধারণ বানরের প্রায় কাছাকাছি হলেও এদের ওজন সাধারণ বানরের থেকে 2/3 কিলোগ্রাম বেশি।

বাসস্থান : উত্তরবঙ্গ, অসম, অরুণাচল প্রভৃতি অঞ্চলে এদের দেখা যায়। আগে সুন্দরবনাঞ্চলেও অসমীয়া বানর দেখা যেত। তবে সুন্দরবন থেকে এরা অনেকদিনই লুপ্ত হয়ে গেছে। হিমালয়ে 6000 ফুট উঁচুতেও এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : সাধারণ বানরের মতোই।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী

হ্রস্বপুচ্ছ বানর

THE STUMPTAILED MACAQUE (*Macaca speciosa*)

আকৃতি : চেহারা, ওজন ও উচ্চতায় এরা অনেকটা অসমীয়া বানরের মতোই। তবে দূর থেকে এদের এক ইঞ্চিরও ছোট লেজ দেখে সাধারণ বানর ও অসমীয়া বানরদের সঙ্গে তফাৎ করা যায়।

বাসস্থান : অসম, অরুণাচল, মেঘালয় প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গলে।

খাদ্য : সাধারণ বানরের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সিংহপুচ্ছ বানর

THE LIONTAILED MACAQUE (*Macaca silenus*)

আকৃতি : সাধারণ বানরের উচ্চতার এই বানরটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল কালো। কপাল থেকে গাল পেরিয়ে মুখের চারপাশে ঘন ছাই রঙের কেশর আছে। এদের

লেজটিও লম্বা, প্রায় 25 থেকে 40 সে.মি.। বাসস্থান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং শিকারের জন্য এদের অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি।

বাসস্থান : পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলের কেরল ও তামিলনাড়ুতে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য : অন্য বানরের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বনেট বানর

THE BONNET MACAQUE (*Macaca radiata*)

আকৃতি : বনেট বানরকে চেনা যায় তার লেজ দেখে। 60 সে.মি. উচ্চতার এই বানরটির লেজ শরীরের থেকে অনেক লম্বা। এদের মাথার লোমের মধ্যিখানে একটা সিঁথি আছে। সাধারণ বানরের মতো এরা মোটাসোটা নয় এবং এদের ওজনও কিছুটা কম।

বাসস্থান : সমস্ত দক্ষিণভারত জুড়েই এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : অন্যান্য বানরের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

শুকরপুচ্ছ বানর

(PIGTAILED MACAQUE) (*Macaca nemestrina*) :

নাগা পাহাড়ে আরেক ধরনের বানর পাওয়া যায় এরা শুকরপুচ্ছ বা পিগটেইল ম্যাকাক। এদের লেজটি খাড়া, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সাধারণ হনুমান

THE COMMON LANGUR (*Presbytis entellus*)

আকৃতি : বসা অবস্থায় সাধারণ হনুমান প্রায় 65 থেকে 75 সে.মি. উঁচু। এদের ওজন 15 থেকে 20 কিলো গ্রামের মতো। এদের গায়ের লোমের রঙ হাল্কা পাটের মতো, প্রায় সাদা এবং মুখ লোমহীন কুচকুচে কালো। এদের লেজটি বেশ লম্বা।

বাসস্থান : প্রায় সমস্ত ভারত জুড়েই এদের অবস্থান। হিমালয়ের 12000 ফুট উচ্চতায়ও এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : সম্পূর্ণ নিরামিষাশী এই প্রাণীটির খাদ্য বনের ফল, ফুল, কুঁড়ি, গাছের কচি ডগা ও পাতা।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হনুমান

THE CAPPED LANGUR (*Presbytis pileatus*)

আকৃতি : বসা অবস্থায় এদের উচ্চতা 60 থেকে 70 সে.মি. ও ওজন 12 থেকে 14 কিলোগ্রাম। স্ত্রী প্রাণীটি কিছুটা ছোট ও হাল্কা। মাথার দু'দিকে সমান্তরাল লোমের গুচ্ছ আছে।

বাসস্থান : অসমের জঙ্গলে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : অন্যান্য হনুমানের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সোনালী হনুমান

THE GOLDEN LANGUR (*Presbytis geei*)

আকৃতি : সাধারণ হনুমানের মাপের এই হনুমানের গায়ের লোম হলদেটে। ওজনে এবং উচ্চতায় এরা সাধারণ হনুমানের মত। রোদ্দুরে গায়ের

রং সোনালী মতো দেখায়। তবে মুখের রং সাধারণ হনুমানের মতোই কালো।

বাসস্থান : এদের দেখা মিলবে একমাত্র অসমের মানস অভয়ারণ্যে সঙ্কোষ নদীর তীরে।

খাদ্য : সাধারণ হনুমানের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

চশমা বানর (হনুমান)

THE SPECTACLED MONKEY (*Presbytis phayrei*)

আকৃতি : সাধারণ হনুমানের মাপের এই প্রাণীটির গায়ের রঙ কালচে বাদামী। এদের বিশেষত্ব হল চোখ দুটির চারধার দিয়ে সাদা চশমার মতো রিং আছে। দূর থেকে এই রিং দেখা যায়।

বাসস্থান : একমাত্র ত্রিপুরার জঙ্গলে এদের বাস।

খাদ্য : সাধারণ হনুমানের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

নীলগিরি হনুমান

THE NILGIRI LANGUR (*Presbytis johni*)

আকৃতি : কুচকুচে কালো রঙের এই হনুমানটির মুখের রঙ কিছুটা হাল্কা। এদের উচ্চতা 75 থেকে 80 সে.মি. ও ওজন 12 থেকে 14 কিলো গ্রাম।

বাসস্থান : পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, আন্নামালাই, পালনি প্রভৃতি অঞ্চলের বনভূমিতে এদের খোঁজ মেলে।

খাদ্য : সাধারণ হনুমানের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

কাকড়াভূক বানর

THE CRAB EATING MACAQUE (*Macaca irusumbropa*)

আর এক ধরনের বানর এদের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এরা হোল কাকড়া ভুক বা ক্র্যাব ইটিং। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

উল্লুক

(THE HOOLOCK GIBBON) (*Hylobates hoolock*)

আকৃতি : ভারতের এই একমাত্র এপ (Ape) টির দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চতা প্রায় 90 সি.এম.। ওদের ওজন 7/8 কিলো গ্রাম। পুরুষ ও অপরিণত স্ত্রী প্রাণীর গায়ের রঙ কালো। স্ত্রী প্রাণীটি পূর্ণবয়স্ক হলে গায়ের রঙ পাটের মতো হয়ে যায়। পুরুষ উল্লুকের চোখের উপরে পরিষ্কার সাদা চওড়া ভুরু থাকে। এদের লেজ নেই আর হাতদুটো অস্বাভাবিক লম্বা। ওই লম্বা লম্বা হাতে গাছের ডাল ধরে ঝোলে। ঝুলে ওরা এদিক ওদিক যায়। সকালে আর বিকেলে দল বেঁধে চলাফেরার সময় 'হু-কু' 'হু-কু' ডাকে।
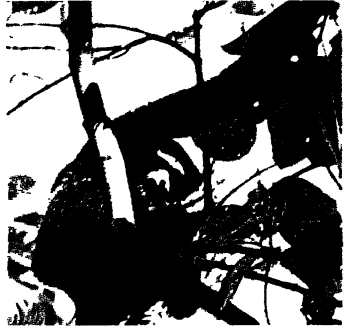
বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গলে, বিশেষত অরুণাচল, মেঘালয়, অসমে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য : ফল, পাতা পোকামাকড়, মাকড়সা এদের খাদ্য। পাতার উপর থেকে শিশির ফোঁটা এরা চুমুক দিয়ে পান করে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

লজ্জাবতী বানর

THE SLOW LORIS (*Nycticebus coucang*)

আকৃতি : প্রায় লেজবিহীন এই প্রাণীটির মাথা ও শরীর এক থেকে সওয়া এক ফুট দীর্ঘ। এদের মাথাটি একেবারে গোল। চোখদুটি মুখের অনুপাতে অনেক বড় ও গোল গোল। সারা শরীর উজ্জ্বল ছাই রঙের নরম লোম দিয়ে ঢাকা। এমনিতে খুব শ্লথগতি হলেও এরা শিকার ধরে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গলে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : ফল, পোকামাকড়, পাখির ডিম প্রভৃতি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ছোট লজ্জাবতী বানর

THE SLENDER LORIS (*Loris tardigradus*)

আকৃতি : এদের শরীরের দৈর্ঘ 8 থেকে 10 ইঞ্চি। ওজন 280 থেকে 350 গ্রাম। এদের শরীর উজ্জ্বল ছাই রঙের। শিরদাঁড়ার উপরে হাল্কা লম্বা দাগ আছে। চোখদুটি বড় ও গোল।

বাসস্থান : দক্ষিণ ভারতের ঘন জঙ্গলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : ল্যান্টানার ফল এদের প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া এরা পোকামাকড়, ছোট পাখি, গেছো ব্যাঙ, ছোট গিরগিটি প্রভৃতি খেয়ে থাকে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভারতীয় বাঘ

THE INDIAN TIGER (*Panthera tigris*)

আকৃতি : বাঘ মাপবার নিয়ম নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত। এই ভাবে মাপ নিলে সাধারণত ভারতের পুরুষ বাঘের দৈর্ঘ্য 9 ফুট থেকে 10 ফুট পর্যন্ত আর স্ত্রী বাঘের 8 ফুট থেকে 9 ফুট পর্যন্ত। ওজন পুরুষ বাঘের 175 থেকে প্রায় 230 কিলো গ্রাম পর্যন্ত আর স্ত্রী বাঘের 130 থেকে 190 কিলো গ্রাম পর্যন্ত। বাঘের গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদের উপর কালো ডোরা। পেটের দিকে সাদা। কানের পেছনদিকে সাদা ছোপ আছে, দূর থেকে যা চোখে পড়ে।

বাসস্থান : রাজস্থানের থর মরুভূমি, পঞ্জাব আর গুজরাট ছাড়া ভারতের আর সর্বত্রই বাঘের দেখা পাওয়া যায়। হিমালয়ের প্রায় দশহাজার ফুট উচ্চতায়ও যেমন বাঘের দেখা মেলে, তেমনই আবার সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলবর্তী ম্যাংগ্রোভ জঙ্গলেও বাঘ দেখা যায়।

খাদ্য : সমস্ত রকম তৃণভোজী প্রাণীই বাঘের খাদ্য। এমনকী নিজের ওজনের চাইতে বেশি ভারী জীবজন্তু মেরে নিয়ে বাঘ অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে বাঘ বনমোরগ, ময়ূরও ধরে, এমনকী সুন্দরবনের বাঘ মাছ এবং কাঁকড়াও খায়। খিদের তাগিদে অনেক সময় বাঘ চিতাবাঘের মতো মাংসাশী প্রাণীকেও খেতে দ্বিধা করে না।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সিংহ

THE INDIAN LION (*Panthera lio persica*)

আকৃতি : ভারতীয় সিংহের দৈর্ঘ্য সাধারণত 9 ফুট থেকে সওয়া 9 ফুটের মধ্যে। পুরুষ সিংহের ওজন 160 থেকে 190 কিলো গ্রাম আর স্ত্রী

সিংহের ওজন 110 থেকে 120 কিলো গ্রাম। পুরুষ সিংহের ঘাড় থেকে কপাল ঘিরে কেশর থাকে। স্ত্রী সিংহের কেশর নেই। দেহ ছোট ছোট, পাটের রঙের লোম ঢাকা আর লেজের ডগাটিতে চুলের কালো গুচ্ছ আছে।

বাসস্থান : এদের পাওয়া যায় একমাত্র গুজরাতের গির অভয়ারণ্যে।

খাদ্য : সিংহের পরিবারে সাধারণত সিংহী শিকার করে। খুব প্রয়োজন না হলে সিংহ শিকারে বের হয় না। জঙ্গলে তৃণভোজী প্রাণী, গ্রাম থেকে চরতে আসা মোষ বা গরু প্রভৃতি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

চিতাবাঘ

THE LEOPARD (*Panthera pardus*)

আকৃতি : পুরুষ চিতাবাঘের দৈর্ঘ্য গড়ে 215 সি.এম. এবং স্ত্রী চিতাবাঘ গড়ে 180 সি.এম। এদের ওজন 50 থেকে 70 কিলো গ্রামের মতো। চিতাবাঘের গায়ে হলুদের উপর কালো রঙের গোল গোল ছাপ থাকে। অঞ্চল ভেদে এদের গায়ের রঙেরও পার্থক্য হয়।

বাসস্থান : সারা ভারতবর্ষ জুড়েই চিতাবাঘের খোঁজ পাওয়া যায়।

খাদ্য : প্রধানত তৃণভোজী প্রাণী এদের খাদ্য। এরা জঙ্গলের ধারে গ্রামের সীমানা থেকে ছাগল, ভেড়া, গরুমোষের বাচ্চা, হাঁস-মুরগি ধরে খায়। এদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য কুকুর।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

তুষার চিতা

THE SNOW LEOPARD (*Panthera uncia*)

আকৃতি : গড়ে 100 সে.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই প্রাণীটির লেজ প্রায় 90 সে.মি। এদের ওজন 35 কিলো গ্রাম থেকে 55 কিলো গ্রাম। তুষারচিতার গায়ের রঙ হাল্কা ছাই রঙের কিন্তু, ক্রমশ পেটের দিকে ধবধবে সাদা। সারা গায়ে কালো গোল গোল ছাপ থাকে। তবে মাথা বা মুখে এই কালো ছাপগুলো যত স্পষ্ট, গায়ের ছাপগুলো ততটা স্পষ্ট নয়।

বাসস্থান : কাশ্মীর, লাডাক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত সমস্ত হিমালয় অঞ্চল জুড়ে তুষারচিতা রয়েছে। বৃক্ষ শ্রেণীর উর্ধে 13000 থেকে 25000 ফুট উচ্চতায় বরফের রাজ্যে এদের বিচরণ।

খাদ্য : পাহাড়ি ভেড়া, ছাগল, খরগোশ প্রভৃতি, তুষার চিতার খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

আমচিতা

THE CLOUDED LEOPARD (*Neofelis nebulosa*)

আকৃতি : নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত আমচিতার দৈর্ঘ্য 190 থেকে 200 সি.এম পর্যন্ত। এদের ওজন 20 কিলো গ্রামের কাছাকাছি। দেহের তুলনায় এদের লেজ বেশ লম্বা। গায়ের রঙ খয়েরি থেকে উজ্জ্বল হলুদ। পেটের দিকটা অনেক ফ্যাকাসে। গায়ে ছাই রঙের লম্বা লম্বা ও মাথার উপর গোল গোল দাগ আছে। শরীরের দাগগুলো কিছুটা মেঘের আকারের মত দেখায় বলে বলে এদের নাম Clouded leopard।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির জঙ্গলে আমচিতার বাস। এরা গাছে থাকতে ভালবাসে।

খাদ্য : আমচিতা রাতের অন্ধকারে গাছের থেকে নেমে শিকার ধরে। পাহাড়ি বস্তিগুলি থেকে প্রায়শই এরা ছাগল, ভেড়া ধরে নিয়ে যায়। প্রধানত, এদের খাদ্য জঙ্গলের তৃণভোজী প্রাণী যেমন, হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

মর্বেল্ড ক্যাট

THE MARBLED CAT (*Felis marmorata*)

আকৃতি : এই বেড়ালটির দৈর্ঘ্য পোষা বেড়ালের কাছাকাছি। তবে সামান্য বড়। কপাল থেকে ঘাড় দিয়ে পেছন পর্যন্ত ছাইরঙের টানা দাগ আছে। পায়ের ভেতরের দিকে ও লেজে গোল গোল দাগ রয়েছে। গায়ের রঙ খয়েরি। এই বেড়ালটির সঙ্গে আমচিতার রঙের বেশ মিল আছে।

বাসস্থান : সিকিম, অসম, অরুণাচল ও মেঘালয়ের জঙ্গলে এদের পাওয়া যায়। আমচিতার মতো এরাও গাছে গাছে ঘোরে।

খাদ্য : পাখি, পাখির ডিম, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি এদের প্রধান খাদ্য-তালিকাভুক্ত।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সোনালী বেড়াল

THE GOLDEN CAT (*Felis temmincki*)

আকৃতি : লেজ সমেত সোনালী বেড়ালের দৈর্ঘ্য 120 সি. এম এর মতো। এদের ওজন 9 থেকে 15 কিলো গ্রাম। শক্ত সমর্থ চেহারা বিশিষ্ট এই বেড়ালটির গা সোনালী থেকে গাঢ় খয়েরি রঙের লোমে ঢাকা। এদের গায়ে কোনও দাগ নেই। বাচ্চাদের শরীরের লোম বড়দের থেকে অনেকটা লম্বা।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : সোনালী বেড়াল সাধারণত ইঁদুর, ছোট হরিণ বা ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চা খায়। মুরগী বা পাখিও এদের খাদ্য তালিকাভুক্ত।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

চিতা বেড়াল

THE LEOPARD CAT (*Felis bengalensis*)

সুব্রত পালচৌধুরী

আকৃতি : লেজ সমেত এই ছোট্ট বেড়ালটির দৈর্ঘ্য 60 সি.এম মতো। এদের ওজন 3.5 থেকে 4.5 কিলোগ্রাম। শরীরের অনুপাতে এদের পা বেশ লম্বা। হলুদ রঙের শরীরে কালো গোল গোল ছাপ, অনেকটা চিতাবাঘের মতো দেখায়।

বাসস্থান : ভারতের সবদিককার জঙ্গলেই চিতা বেড়ালের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : পাখি, পাখির ডিম প্রভৃতি এদের খাদ্য-তালিকাভুক্ত।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাঘরোল

THE FISHING CAT (*Felis viverrina*)

আকৃতি : 100 সি. এম দৈর্ঘ্যের এই বেড়ালটি ওজনে 7 থেকে 12 কিলো গ্রাম। চিতাবেড়ালের চেয়ে শরীরের তুলনায় এদের লেজ ছোট। এদের গায়ের লোমগুলো মোটা ও খসখসে। গায়ের রঙ গাঢ় ছাই, আর তার উপর কালো রঙের ছোট ছোট ও গোল গোল ছাপ আছে এবং এদের পিঠের দিক ক্রমশ সাদা হয়। কপালের উপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত ছয় থেকে আটটি লম্বা দাগ আছে। সামনের পায়ে দুটি করে কালচে ডোরা আছে।

বাসস্থান : পশ্চিমবাংলা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িষ্যার কোনও কোনও জায়গায় জলাভূমির আশেপাশে বাঘরোল দেখা যায়। দক্ষিণভারতেও

এদের সন্ধান মেলে। হিমালয়ের 5000 ফুট উচ্চতায়ও বাঘরোল দেখা যায়।

খাদ্য : মাছ ধরতে এরা ওস্তাদ। মাছ ছাড়া এরা গরুমোষের বাচ্চা, ভেড়া, ছাগল খেয়ে থাকে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বনবেড়াল

THE JUNGLE CAT (*Felis chaus*)

আকৃতি : চেহারায় তেমন বড় নয় এই বনবেড়াল। দৈর্ঘ্যে বনবেড়াল 60সি. এম এর মত। এদের ওজন 4·5 থেকে 6 কিলো গ্রামের কাছাকাছি। গায়ের রঙ পাটের মতো। লেজে কালোকালো রিং আছে আর লেজের ডগাটি কালো। চোখের রঙ ফ্যাকাসে সবুজ।

বাসস্থান : ভারতের প্রায় সবদিকের জঙ্গলেই বনবেড়াল দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য : ইঁদুর, পাখি, এমনকি গ্রামের আশপাশ থেকে হাঁস মুরগিও ধরে খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ক্যারাকাল *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না।)*

THE CARACAL (*Felis caracal*)

আকৃতি : দৈর্ঘ্যে এরা প্রায় 3 ফুটের কাছাকাছি। ওজন প্রায় 6 থেকে 9 কিলো গ্রাম। এদের কানের ডগায় একগুচ্ছ সরু, খাড়া লম্বা লোম আছে। এদের রঙ লালচে ছাই রঙের।

বাসস্থান : রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এদের সন্ধান মেলে। মধ্যপ্রদেশের পান্না জাতীয় উদ্যানে এদের দেখা যায়।

খাদ্য : ইঁদুর ও ছোট তৃণভোজী প্রাণী এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

লাডাক অঞ্চলে ক্যারাকালের মতোই প্রায় সাড়ে তিনফুট লম্বা আরেক জাতের বেড়ালের সন্ধান মেলে। এদের নাম লিঙ্কস LYNX (*Felis lynx*)

পাল্লাসেস ক্যাট *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না।)*
THE PALLAS'S CAT (*Felis manul*)

আকৃতি : পোষা বেড়ালের থেকে এরা মাপে ছোট। এদের ওজন 3 থেকে 4 কিলো গ্রাম। এদের বিশেষত্ব ছোট ছোট কানদুটি। প্রায় গালের কাছাকাছি অবস্থিত কানদুটির মধ্যে অনেকটা দূরত্ব। ছাইরঙা মুখ আর ঘাড় থেকে শরীরটা প্রায় রূপোলি। পেছনদিকের পা দুটিতে কখনও লম্বা লম্বা দাগ থাকে। লেজে কালো রিং আছে ও ডগাটি কালো।

বাসস্থান : লাডাক অঞ্চলে এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : ছোট প্রাণী ও পাখি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ডেসার্ট ক্যাট *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না।)*
THE DESERT CAT (*Felis libyca*)

আকৃতি : প্রায় গৃহপালিত বেড়ালের মাপের এই বন্য বেড়ালটির গায়ের রঙ হাল্কা হলুদ এবং ওজন 2 থেকে 3 কিলো গ্রাম। গায়ে অসংখ্য ছাই রঙা গোল, গোল দাগ রয়েছে। লেজের নীচের দিকে কালো রঙের কয়েকটি রিং আছে। গালে সমান্তরাল দাগ রয়েছে।

বাসস্থান : ভারতের মরু অঞ্চলে এদের দেখা যায়।

খাদ্য : ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ও ছোট পাখি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

রাস্টি স্পটেড ক্যাট *(বাংলা নাম পাওয়া যান না।)*
RUSTY SPOTTED CAT (*Prionailurus rubiginosus*)

আকৃতি : বেড়াল পরিবারের ক্ষুদ্রতম এই সদস্যটির ওজন 1 থেকে 1·5 কিলো গ্রাম। এদের শরীর হাল্কা হলদেটে ছাই রঙের। মাথার পেছন থেকে শুরু করে এদের শরীরে সারি সারি মরচের মত খয়েরি রঙের গোল গোল দাগ থাকে।

বাসস্থান : প্রধানত এদের দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া যায় তবে উত্তর ভারতেও বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও এদের দেখা যায়।

খাদ্য : সঠিক খাদ্য তালিকা পাওয়া যায় না। তবে এরা বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর ও ব্যাঙ খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

খাটাস

THE COMMON PALM CIVET (*Paradoxusus hermaphroditus*)

আকৃতি : 120 সেন্টিমিটার লম্বা এই প্রাণীটির দেহ ও লেজ প্রায় সমান সমান এবং ওজন 2·5 থেকে 4·5 কিলো গ্রাম। এদের গায়ের রঙ গাঢ় ছাই। পিঠের উপর দিয়ে কালো লম্বা একটা দাগ আছে। পায়ে ও কাঁধে কালো কালো গোল দাগ আছে। মুখটি সরু ও কানদুটি খাঁড়া এদের গন্ধগ্রন্থি থেকে আতপ চালের মতো একটা উগ্র গন্ধ বের হয়।

বাসস্থান : ভারতের প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : লোকালয়ের আশেপাশে, এমনকী শহরের মধ্যে ঢুকেও সে তার খাদ্য সংগ্রহ করে। পাখি, ছোট জানোয়ার, এমনকী ফলও এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

গন্ধগোকুল

THE SMALL INDIAN CIVET (*Viverricula indica*)

আকৃতি : দৈর্ঘ্যে এই প্রাণীটি 115 থেকে 120 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এদের ওজন 3 থেকে 4 কিলো গ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এদের গায়ের রঙ হলদেটে খয়েরি। দুপাশে লাইন করে কালো কালো দাগ আছে। পিঠের দিকে সরু সরু লাইন আছে।

বাসস্থান : ভারতের প্রায় সর্বত্রই এদের দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য : মাটিতে ঘুরে ঘুরে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে। ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, পাখি, গিরগিটি প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাঘদোস

THE LARGE INDIAN CIVET (*Viverra zibettea*)

আকৃতি : 125 সেন্টিমিটার দীর্ঘ এই প্রাণীটির দৈহিক গঠন ভামের মতোই। এদের মাথা বেশ লম্বাটে, বেঁটে বেঁটে পা ও নিচু দেহ। এদের মাথার থেকে শিরদাঁড়া বরাবর কালো একটা দাগ আছে। মাথার উপরের দিকে ক্রমশ ছাই থেকে খয়েরি। এদের দুটি গন্ধের গ্রন্থি আছে।

বাসস্থান : উত্তরবঙ্গ ও সিকিম, অসম, অরুণাচল প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব রাজ্যে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : সাপ থেকে শুরু করে ব্যাঙ, পোকামাকড়, পাখির বাচ্চা, ডিম সবই এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হিমালয়ান পাম সিবেট *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না)*

THE HIMALAYAN PALM CIVET (*Paguma larvata*)

আকৃতি : মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এদের দৈর্ঘ্য 120 সে.মি. চেয়ে সামান্য বেশি এবং ওজন 3·5 থেকে 5 কিলো গ্রাম। দূর থেকে সাদা গোঁফ দেখে এদের চেনা যায়। এদের পিঠের রঙ লালচে, পেটের দিক সাদা ও নাকের উপর দিয়ে সাদা রঙের একটা দাগ আছে।

বাসস্থান : কাশ্মীর থেকে প্রায় সমস্ত হিমালয় জুড়েই এদের উপস্থিতি রয়েছে।

খাদ্য : ভামের মতোই এদের খাদ্যাভ্যাস।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

স্পটেড লিনসাং *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না।)*

SPOTTED LINSANG (*Herpastes edwardsi*)

আকৃতি : 37 সে.মি. লম্বা এই ভাম জাতীয় প্রাণীটির লেজের মাপ 2·5 সে.মি.। এদের ওজন 550 গ্রামের কাছাকাছি।

বাসস্থান : ভারতে সিকিম ও অসমের পার্বত্য জঙ্গলে এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা পাখি, পাখির ডিম ও ছোটখাটো প্রাণী খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

এছাড়া আরেক ধরনের ভামের সন্ধান মেলে দক্ষিণ-ভারতে। এরা হল MALABAR CIVET ; *(V. megaspila)*। সংরক্ষণ আইনে এরা তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

নেউল

THE COMMON MONGOOSE (*Herpastes edwardsi*)

আকৃতি : হলদেটে ছাই রঙের এই প্রাণীটি নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য 90 সি. এম. এবং ওজন 1·5 কিলো গ্রামের মত । লেজের ডগাটি সাদা বা হলদেটে লাল।

বাসস্থান : ভারতের সব দিকেই এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, ইঁদুর, বিছে এদের খাদ্য। বড় জন্তুর মারা জানোয়ারদের থেকেও এরা চুরি করে ভাগ বসায়। এরা সাপের ভীষণ শত্রু।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বেজি

THE SMALL INDIAN MONGOOSE (*Herpestes auropunctatus*)

আকৃতি : নেউল থেকে মাপে এরা বেশ ছোট আর সরু। 50 সে.মি. লম্বা প্রাণীটির গায়ের রঙ হাল্কা সবুজ খয়েরি এবং ওজন 750 গ্রামের কাছাকাছি। গায়ের লোম খুব নরম। রোদে বা আলোয় গা দিয়ে হাল্কা সোনালী আভা দেখা যায়। শরীর অনুপাতে এদের লেজ ছোট।

বাসস্থান : এদের পাওয়া যায় উত্তর ভারতে; পূর্ব দিকে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা ও আসাম পর্যন্ত।

খাদ্য : ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, সাপ, পোকামাকড়, টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি এদের খাদ্য তালিকাভুক্ত।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

স্ট্রাইপডনেকড মংগুজ *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না)*

THE STRIPEDNECKED MONGOOSE (*Harpestes Vitticollis*)

আকৃতি : এই মহাদেশের বেজিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই প্রজাতিটি 90 সে.মি. দৈর্ঘ্যের। প্রাণীটির ওজন 3 কিলো গ্রামের চেয়েও বেশি। কানের কাছে থেকে কাধ পর্যন্ত কালো দাগ আছে। এদের গা ছাই রঙের লোমে ভরা। কিন্তু লেজের ডগাটি বাদামী। পেছনের দিক বেশি বাদামী।

বাসস্থান : দক্ষিণ ভারতে এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য : বড় মেঠো ইঁদুর, সাপ, পাখি, এমনকী খরগোসও এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাদামী বেজি

THE BROWN MONGOOSE (*Herpestes fuscus*)

আকৃতি : 80 সে.মি. লম্বা এই বেজির গায়ের রঙ বাদামি বা খয়েরি। এদের ওজন 2·5 কিলো গ্রামের চেয়ে বেশি।

বাসস্থান : দক্ষিণ ভারতে 6000 ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় এদের দেখা যায়।

খাদ্য : বড় ইঁদুর, সাপ, পাখি. গিরগিটি, বড় ব্যাঙ এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

কাঁকড়াভুক্ বেজি

THE CRABEATING MONGOOSE (*Herpestes urva*)

আকৃতি : এদের গায়ের ছাই রঙা লোমগুলি বেশি খসখসে। এদের ওজন 1·8 থেকে 2·5 কিলো গ্রাম। নাকের নীচ থেকে গলা পেরিয়ে ঘাড় পর্যন্ত সাদা চওড়া দাগ আছে। লেজের রঙ নীচের দিকে ক্রমশ সাদাটে হয়ে গেছে।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের দেখা যায়।

খাদ্য : এরা কাঁকড়া বা মোলাস্কের শক্ত খোলা ভেঙে খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

এছাড়াও মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে আর এক ধরনের বেজি পাওয়া যায়, এরা হল রাডি মঙগুজ (Ruddy Mongoose)।

রয়াল'স ভোল *(বাংলায় নাম পাওয়া যায় না)*

ROYLE'S VOLE (*Alticola roylei*)

আকৃতি : লেজ সমেত এদের দৈর্ঘ্য 12 থেকে 15 সেন্টিমিটার। লেজের মাপ দেহের অর্ধেকেরও কম। গোলাকার মাথা ও কান দুটি ছোট। এদের রঙ লালচে বাদামী। চেহারা প্রায় ইঁদুরেরই মতো।

বাসস্থান : কুমায়ুন ও হিমালয়ের 10,000 ফুট উঁচুতেও এদের দেখা যায়। হিমালয়ে, কাশ্মীর, লাডাক প্রভৃতি অঞ্চলে এদের সন্ধান মেলে।

খাদ্য : মোটা ঘাস ও শেকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের অন্য তিনটি প্রজাতি হল Sikkim vole, Mervee vole ও Quetta vole.

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হোরি বাম্বু র‍্যাট *(বাংলার নাম পাওয়া যায় না)*

THE HOARY BAMBOO RAT (*Rhizomys pruinosus*)

আকৃতি : গাঢ় ধূসর রঙের এই ইঁদুরটির দৈর্ঘ্য লেজ ছাড়া 30 থেকে 36 সেন্টিমিটার।

বাসস্থান : অসমে এদের খোঁজ মেলে।

খাদ্য : এরা গাছের শেকড়, ঘাস ও পাতা খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-5 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভারতে যে বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর পাওয়া যায় সেগুলি মধ্যে উল্লেলযোগ্য — Common House Rat (*Rattus rattus*), Brown Rat (*Rattus norvegicus*), Baridicoot Rat (*Bindicota indica*), House Mouse (*Musmusculus*) প্রভৃতি।

হায়না

THE STRIPPED HYENA (*Hyaena hyaena*)

আকৃতি : অনেকটা কুকুরের মতো দেখতে প্রাণীটির পেছনের পা দুটি সামনের পা দুটির থেকে ছোট। চওড়া কপাল ও গোলাকৃতি কান। ধূসর রঙের শরীরে কালো কালো, ডোরা রয়েছে। বুকের কাছের লোমগুলি বেশ লম্বা। দেহের অনুপাতে এদের লেজ ছোট। 90 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই প্রাণীগুলি লম্বায় 150 সেন্টিমিটার। ওজন প্রায় 40 কিলো গ্রাম। স্ত্রী প্রাণীটি প্রায় 35 কিলো গ্রাম।

বাসস্থান : সারা ভারত জুড়েই এদের দেখা যায়। সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলের ধারে গ্রামের আশেপাশে এরা ঘোরাঘুরি করে।

খাদ্য : অন্য জন্তুর মারা শিকারে এরা চুরি করে ভাগ বসায়। তাছাড়া ছাগল, ভেড়ার বাচ্চা ও কুকুরও এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

নেকড়ে

THE INDIAN WOLF (*Canis lupus*)

আকৃতি : প্রায় 100 থেকে 150 সেন্টিমিটার দৈর্ঘের এই প্রাণীটির উচ্চতা 65 থেকে 75 সেন্টিমিটার। ওজন 20 থেকে 25 কিলো গ্রামের মতো। এদের গায়ের রঙ বালির মতো এবং পিঠের দিকের রঙ কালচে। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের চেহারার সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল।

বাসস্থান : ভারতের সর্বত্রই নেকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : নেকড়ে সারা দিনরাত শিকারের খোঁজে ঘোরে। ধরতে পারলে এরা খরগোস থেকেশুরু করে ছাগল, ভেড়া পর্যন্ত সব খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তালিকা-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

আরও একটি নেকড়ের উপপ্রজাতির সন্ধান ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। নাম তিব্বতি নেকড়ে (Canis lupus chanco)। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর এরা তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

শেয়াল

THE JACKAL (*Canis aureus*)

আকৃতি : দৈর্ঘ্যে শেয়াল 80 থেকে 100 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। ওজন 8 থেকে 10 কিলো গ্রাম। নেকড়ের সঙ্গে চেহারায় ও রঙে এদের বেশি মিল আছে। লেজ বেশ মোটা।

বাসস্থান : ভারতের সর্বত্রই শেয়াল আছে। লোকালয়ের প্রায় ভেতরেও শেয়াল ঢুকে পড়ে।

খাদ্য : লোকালয় থেকে এরা হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়ার ছানা, মরা জন্তু জানোয়ার অথবা অন্য কোন পশুর খাওয়া শিকার এরা চুরি করে খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

খ্যাঁকশেয়াল

THE BENGAL FOX (*Vulpes bengalensis*)

আকৃতি : কুকুরাকৃতি মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত খ্যাঁকশেয়ালের দৈর্ঘ্য 70 থেকে 95 সেন্টিমিটার। ওজন 2 থেকে 3 কিলো গ্রাম। গায়ের রঙ লালচে বাদামি, লেজের ডগা কালো। গায়ের লোম নরম।

বাসস্থান : হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত সবদিকেই খ্যাঁকশেয়ালের দেখা পাওয়া যায়। সাধারণত এরা ফাঁকা জায়গা পছন্দ করে।

খাদ্য : এদের প্রধান খাদ্য ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী ও সরীসৃপ। গ্রাম থেকে হাঁস-মুরগি ধরেও খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বড় খ্যাঁকশেয়াল

THE RED FOX (*Vulpes vulpes*)

আকৃতি : খ্যাঁকশেয়ালের চাইতে এই শেয়ালটি একটু বড়। 105 সেন্টিমিটার থেকে 120 সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং ওজন 4·5 থেকে 5·5 কিলো গ্রাম। এই প্রাণীটির গা সুন্দর, নরম, বড় বড় লোমে ঢাকা এবং গায়ের রঙ লালচে বাদামী। কানের উপরের অর্ধেক কালো আর লেজের ডগা সাদা।

বাসস্থান : কাশ্মীর, লাডাক, হিমালয় থেকে উত্তর পশ্চিমের মরু অঞ্চল পর্যন্ত এদের সর্বত্র দেখা যায়।

খাদ্য : ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, খরগোস, কাঠবেড়ালি, এমনকী মাটিতে চরা পাখি, যেমন তিতির প্রভৃতি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ঢোল

THE INDIAN WILD DOG (*Cuon alpinus*)

আকৃতি : এই বুনো কুকুরটির মাথা, দেহ ও লেজ সমেত দৈর্ঘ্য 130 সেন্টিমিটারের মতো। উচ্চতায় এরা 45 থেকে 55 সেন্টিমিটার। এর ওজন 20 কিলো গ্রামের মত। গায়ের রঙ বাদামী। লেজ মোটা ও পুরোটাই কালো।

বাসস্থান : এদেশে প্রায় সবদিকেই ঢোলের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : এরা দলবদ্ধভাবে শিকার করে। হরিণ, শুয়োর ইত্যাদি এদের খাদ্য। দলবদ্ধ হয়ে এরা ভাল্লুক, বুনো মোষ, গাউর, এমনকী বাঘকেও মেরে খেয়ে ফেলতে পারে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সজারু

THE INDIAN PORCUPINE (*Hystrix indica*)

আকৃতি : এদের শরীরের দৈর্ঘ্য 70 থেকে 90 সেন্টিমিটার। ছোট্ট লেজটির মাপ 8 থেকে 10 সেন্টিমিটার। ওজন 10 থেকে 18 কিলো গ্রাম। মুখটা সরু। সমস্ত গা মোটা ও ছুঁচোলো কাঁটায় ভরা। কাঁটাগুলিতে সাদা ও কালো রিং আছে। উত্তেজিত হলে শরীরের কাঁটাগুলি দাঁড়িয়ে ওঠে ও প্রতিরক্ষার কাজ করে।

বাসস্থান : ভারতের সর্বত্রই এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : শাকসবজী, শেকড়, শস্য ইত্যাদি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভাল্লুক

THE SLOTH BEAR
(*Melursus ursinus*)

আকৃতি : সাধারণত ভাল্লুকের দৈর্ঘ্য 140 থেকে 170 সেন্টিমিটারের মধ্যে। ওজন 70 থেকে 140

কিলো গ্রাম। নাকের ডগা ও নীচের ঠোঁট লম্বা হয়ে সামনের দিকে ঝোলা। গায়ে লম্বা লম্বা কালচে খয়েরি রঙের লোম। গলায় V এর মতো দাগ থাকে। লম্বাটে আঙুলের আবার নখগুলি বেশ লম্বা, লম্বা।

বাসস্থান : ভারতের প্রায় সমস্ত দিকের জঙ্গলেই এদের সন্ধান মেলে।

খাদ্য : এদের প্রিয় খাদ্য ফল হলেও খিদের তাড়নায় এরা মরা জীবজন্তুও খায়। এদের আরেক প্রিয় খাদ্য উইপোকা। মহুয়া ফল পাকবার সময় এরা গাছের নীচে পড়ে থাকা মহুয়া ফুল খেতে আসে। মধু এদের প্রিয় খাদ্য। মৌচাক ভেঙে এরা মধু খায়। গায়ে বড় বড় লোম থাকায় মৌমাছি এদের কামড়াতে পারে না।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হিমালয়ের কালো ভাল্লুক

THE HIMALAYAN BLACK BEAR (*Selenarctos thibetaurs*)

আকৃতি : হিমালয়ের কালো পুরুষ ভাল্লুকের দৈর্ঘ্য 140 থেকে 195 সেন্টিমিটার পর্যন্ত। ওজন 90 থেকে 115 কিলো গ্রাম। স্ত্রী ভাল্লুকের ওজন কিছু কম। গায়ে লম্বা লম্বা কালো রঙের লোম থাকে। গলায় সুস্পষ্ট দাগ 'V' থাকে।

বাসস্থান : কাশ্মীর, হিমালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের বাস। হিমালয়ের 12000 ফুট উচ্চতায়ও এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : বুনো ফল, শিকড়, বাদাম, উইপোকা, গুবরে পোকা ইত্যাদি এদের খাদ্য। গ্রামের কাছাকাছি গরু মোষও ধরে খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাদামী ভাল্লুক

THE BROWN BEAR (*Ursus arctos*)

আকৃতি : 180 থেকে 140 সেন্টিমিটার লম্বা এই ভাল্লুকটির গায়ের রঙ খয়েরি। হিমালয়ের কালো ভাল্লুকদের থেকে এরা ওজনে ভারি। গায়ে এদের অসীম শক্তি।

বাসস্থান : মধ্য হিমালয়ে এদের বাস।

খাদ্য : ইঁদুর থেকে শুরু করে গৃহপালিত পশু পর্যন্ত এরা খাদ্য। এছাড়া উঁইপোকা, বুনো ফল, কচি লতা, শিকড় ইত্যাদি এরা খেয়ে থাকে। খাবারের অভাবে এরা মৃত প্রাণীও খেয়ে থাকে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

লাল পান্ডা

THE RED PANDA (*Ailurus fulgens*)

আকৃতি : এদের মুখ চ্যাপ্টা, খাড়া খাড়া কানের ডগা ছুঁচলো। উজ্জ্বল বাদামি রঙের নরম লোমে ঢাকা শরীর। মুখ ও নীচের ঠোঁট সাদা। লেজে খয়েরি রিং আছে। মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত 100 সেন্টিমিটার। ওজন প্রায় 4 কিলো গ্রাম।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতের হিমালয়ের বনভূমিতে এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য : শিকড়, কচিপাতা, বুনো ফল, পাখির ডিম, পোকামাকড় ইত্যাদি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদ : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বিন্টুরং

BINTURONG (*Arctictis binturong*)

আকৃতি : সিভেট জাতীয় এই প্রাণীটির আকৃতি অনেকটা ভাল্লুকের মতো। গায়ের রং কালো থেকে গাঢ় বাদামি। মাথা থেকে শরীরের দৈর্ঘ্য 70 থেকে 90 সে:মি: আর লেজটি প্রায় 70 থেকে 75 সে.মি.। এদের সারা শরীর বড়, খসখসে লোমে ঢাকা। লেজটির গোড়ার দিকটি বড় বড় লোমে ঢাকা।

বাসস্থান : ভারতে সিকিম ও আসাম ও অরুণাচলের ঘন অরণ্যে এদের বাস। সাধারণত গাছের উপরে থাকতে ভালোবাসে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারেও এদের সন্ধান মেলে।

খাদ্য : বিন্টুরং উভভোজী প্রাণী। ছোট পাখি, ছোট জন্তু-জানোয়ার ও ফলমূল এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাদুড়

THE FLYING FOX (*Pteropus giganteus*)

আকৃতি : এদের গায়ের রঙ কালচে খয়েরি। ডানা কালো। মুখের আকৃতি শেয়ালের মতো। চোখদুটি গোল গোল। পায়ের সঙ্গে ডানাদুটি পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। সারা দিন বিশ্রাম করে ও সূর্যাস্তের পর ক্রিয়াকলাপ শুরু করে। এরা লম্বায় 230 মি.মি.। এদের ডানা 122 মি.মি.।

বাসস্থান : সারা ভারতেই এদের দেখা যায়।

খাদ্য : ফল ও ফলের রসই এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-5 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাদুড়

THE FULVOUS FRUIT BAT (*Rousettus leschenaulit*)

আকৃতি : হাল্কা খয়েরি এই বাদুড়টি লম্বায় 127 মি.মি.। সাধারণত সন্ধ্যার আকাশে এদের উড়তে দেখা যায়। পেছনের থাবা দুটি লাগিয়ে দিয়ে এরা মাথা নিচু করে দিনের বেলায় ঝুলে থাকে।

বাসস্থান : সারা ভারতেই এদের দেখা যায়।

খাদ্য : ফলের রসই এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-5 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বাদুড়

SHORT-NOSED FRUIT BAT (*Cynopterus sphinx*)

আকৃতি : মাথা থেকে শরীর পর্যন্ত এই জাতীয় বাদুড়ের দৈর্ঘ্য 112 মি.মি ও লেজটি 10 মি.মি। দূর থেকে বিভাজিত নাকটি দেখে এদের চেনা যায়। প্রায় নির্লোম কানদুটির ধারটিতে সাদা রঙের দাগ আছে। গায়ের রঙ হলদেটে খয়েরি।

বাসস্থান : সাধারণত এদের সন্ধান মেলে মধ্যভারতের নীচের দিক থেকে সমস্ত দক্ষিণ ভারত জুড়ে।

খাদ্য	:	অন্যান্য বাদুড়ের মতোই ফলমূলই এদের খাদ্য।
সাংরক্ষণিক মর্যাদা	:	এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

বাদুড়

INDIAN FALSE VAMPIRE (*Megaderma lyra*)

আকৃতি	:	85 মি:মি: দৈর্ঘ্যের এই বাদুড় প্রজাতিটির শরীরটি ছাই রঙের। শরীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এদের কানদুটি।
বাসস্থান	:	মধ্যভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে।
খাদ্য	:	ছোট, ছোট পাখি, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি এদের প্রিয় খাদ্য।
সাংরক্ষণিক মর্যাদা	:	এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

বাদুড়

GREAT EASTERN HORSESHOE BAT (*Rhinoloplus luctus*)

আকৃতি	:	বড়সড় আকৃতি এই বাদুড়টির শরীরের দৈর্ঘ্য 90 মি:মি: ও লেজ 65 মি:মি:। এদের শরীরটি কুচকুচে কালো লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা। কানদুটি বেশ লম্বা এবং উপরের অংশ চ্যাপ্টা।
বাসস্থান	:	হিমালয় ও পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে এদের দেখা পাওয়া যায়।
খাদ্য	:	সন্ধ্যা বেলায় নিঃশব্দে এরা শিকার ধরতে বের হয়। ব্যাঙ, পোকামাকড়, ছোট পাখি প্রভৃতি এদের খাদ্য।
সাংরক্ষণিক মর্যাদা	:	এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

বাদুড়

TICKELL'S BAT (*Hesperoptenus tickelli*)

আকৃতি	:	65 মি:মি: লম্বা এই বাদুড়টির লেজের মাপ 50 মি:মি। এদের মাথার রঙ ধূসর, যদিও শরীর হলদে। কানের গোড়ার দিকে সাদাটে লোমের গুচ্ছ আছে।

বাসস্থান : সারা ভারত জুড়েই এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য : এরা প্রধানত পোকামাকড় ধরে খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

বাদুড়

SEROTINE (*Eptesicus serotinus*)

আকৃতি : এ জাতীয় বাদুড়ের শরীরটি 72 মি:মি: লম্বা আর লেজের মাপ 50 মি.মি. এদের শরীরের রঙ খয়েরি। পেটের নীচের দিকের রং ফ্যাকাসে। মাথা চ্যাপ্টা।

বাসস্তান : কাশ্মীর থেকে আসাম হিমালয় পর্যন্ত এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : পোকামাকড় এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

বাদুড়

PAINTED BAT (*Kerivoula pieta*)

আকৃতি : ভারতীয় বাদুড়গুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট এই প্রাণীটির শরীরের দৈর্ঘ্য 38 মি.মি.। লেজটি শরীরের থেকে বড়। লেজের মাপ 42 মি.মি. শরীরের রঙ কমলালেবুর মতো। ডানার কালো পাতলা চামড়াটিতে হলদে ছিট আছে। দুর থেকেও অন্যান্য বাদুড় থেকে এদের আলাদা ভাবে চেনা যায়।

বাসস্থান : সারাভারত জুড়েই এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য : পোকামাকড়ই এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

চামচিকে

THE PIPISTRELLE (*Pipistrele coromandra*)

আকৃতি : লেজ সমেত চামচিকে লম্বায় প্রায় 80 মি.মি.-এর কাছাকাছি। এদের গায়ের রঙ গাঢ় খয়েরি। নাক ও মুখ চ্যাপ্টা। এদের স্বভাবও বাদুড়ের মতোই।

বাসস্থান : সর্বত্রই এদের দেখা যায়।

খাদ্য : ছোট ছোট পোকা, ফড়িং ফল ইত্যাদি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : এই জাতীয় বাদুর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তপশীল বর্হিভূত, কিন্তু পরাগমিলন ও বীজ ছড়ানোর জন্যে এদের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন।

খরগোস *(ব্ল্যাকস্পড)*

THE BLACKNAPED HARE (*Lepus nigricollis nigricollis*)

আকৃতি : এই প্রজাতির খরগোসের চোখের থেকে কাঁধ পর্যন্ত এবং লেজের উপরের দিকে কালো ছোপ থাকে। এদের গায়ের রঙ সাধারণভাবে ধূসর। এদের ওজন 2 থেকে 3·5 কিলো গ্রাম। লম্বায় এরা 50 থেকে 60 সেন্টিমিটার।

বাসস্থান : দক্ষিণ ভারত থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : কচি ঘাস এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-4 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

খরগোস *(হিসপিড)*

THE HISPID HARE (*Caprolaguse hispidus*)

আকৃতি : ওজনে ও লম্বায় এরা *Lepus nigricollis nigricollis*-এর মতোই। তবে এদের লেজ ছোট। পীঠের দিকের রঙ কালচে খয়েরি। নীচের দিকটা ফ্যাকাসে খয়েরি। কানের বাইরের দিক খয়েরি।

বাসস্থান : আসাম থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে উত্তর প্রদেশের তরাই-এর বনভূমি পর্যন্ত সন্ধান মেলে।

খাদ্য : অন্যান্য খরগোসের মতো এদেরও প্রিয় কচি ঘাস।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভোঁদড় *(কমন অটার)*

THE COMMON OTTAR (*Lutra lutra*)

আকৃতি : লেজ সমেত দৈর্ঘ্য 100 থেকে 125 সেন্টিমিটার। গায়ের রঙ কালচে মেটে। নাকের ডগায় অনেকখানি লোমশূন্য। বেঁটে পা বিশিষ্ট এই প্রাণীটি বেশির ভাগ জলে থাকাই পছন্দ করে।

বাসস্থান : কাশ্মীর, হিমালয়, অসম, অরুণাচল ও দক্ষিণভারতে এই প্রজাতির ভোঁদর দেখা যায়।

খাদ্য : যদিও মাছ এদের প্রধান খাদ্য তবুও মাছ না পেলে ইঁদুর, ব্যাঙ সবই খায়। সাধারণত এরা সন্ধে থেকে সারারাত শিকার করে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভোঁদড় *(ক্ললেস অটার)*

THE CLAWIESS OTTAR (*Aonyx cinerea*)

আকৃতি : 70 থেকে 90 সেন্টিমিটার লম্বা এই প্রজাতিটির ওজন 3 থেকে 6 কিলো গ্রাম। খুব ছোট ছোট নখবিশিষ্ট এদের থাবাগুলি। গায়ের রঙ বাদামি আর পেটের দিকে হাল্কা।

বাসস্থান : উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : মাছের থেকেও এরা কাঁকড়া, মোলস্ক-এর উপর বেশি নির্ভরশীল।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

উদবেড়াল

SMOOTH INDIAN OTTAR (*Lutra perspicillata*)

আকৃতি : 40 থেকে 45 সে.মি. লম্বা এ জাতীয় ভোদরের ওজন 7 থেকে 12 কিলো গ্রাম, ভোদরের সঙ্গে এদের তফাৎ শারীরিক গঠনে। এরা ভোদরের তুলনায় মেদবিহীন এবং গায়ের লোম নরম কালচে খয়েরি।

বাসস্থান : হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের শেষ পর্যন্ত।

খাদ্য : মাছ এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

মার্টেনস *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না)*

THE MARTENS (*Martes foina*)

আকৃতি : মার্টেন লম্বায় 25 থেকে 45 সেন্টিমিটার (মাথা থেকে লেজ)। লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও শরীরের প্রায় অর্ধেক। এদের গায়ের রঙ ধূসর খয়েরি। শরীর লম্বাটে, কিন্তু পা-গুলি শরীরের অনুপাতে লম্বা। শরীরের গঠন কিছুটা ভামের মতোন।

বাসস্থান : ভারতবর্ষে এদের দেখা মেলে হিমালয়ের পূর্ব দিকে সিকিম পর্যন্ত আর কাশ্মীরে।

খাদ্য : এদের প্রিয় খাবার মাংস হলেও জঙ্গলের ফল, বাদাম, মধুও এরা খেয়ে থাকে। গাছে উঠে কাঠবেড়ালি, পাখি ইত্যাদি এরা ধরে খায়। কাশ্মীর অঞ্চলের বেরী ওদের প্রিয়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন *(বাংলা নাম পাওয়া যায় না)*

THE YELLOWTHROATED MARTEN (*Martes flavigula*)

আকৃতি : লেজ সমেত এই প্রাণীটি দৈর্ঘ্য 90 থেকে 103 সেন্টিমিটার। এদের লেজ লম্বা। এদের গলা থেকে ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত হলদে রঙের ব্যান্ড আছে।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের সন্ধান মেলে।

খাদ্য : এরা গাছে উঠে পাখি ও পাখির ডিম, কাঠবেড়ালি ইত্যাদি খায়। মাটিতে খরগোস, সাপ, গিরগিটি এমনকী সুযোগ পেলে হরিণের মতো বড় প্রাণীকেও খেতে পিছু পা হয় না।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হাতি

THE ELEPHANT (*Elephas maximus*)

আকৃতি : উচ্চতায় পুরুষ হাতিরা 2·50 থেকে 3 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্ত্রী হাতি 30 সেন্টিমিটারের মতো কম। ধূসর রঙের মোটা চামড়া বিশিষ্ট এই প্রাণীর গায়ে শক্ত শক্ত লোম রয়েছে। আফ্রিকান হাতির তুলনায় এদের কপাল চ্যাপ্টা ও কান ছোট। এদের শুঁড়ের শেষে উপরের দিকে একটি মাত্র ঠোঁট থাকে। কোনও কোনও ভারতীয় পুরুষ হাতির গজদাঁত থাকে। মেয়ে হাতির থাকে না। যে সব পুরুষ হাতির গজদাঁত নেই তাদের 'মাখ্না' বলা হয়। হাতির দাঁত বিভিন্ন রকমের হয় যেমন মাটির দিকে মুখ করা, বাঁকানো ও উপরের দিকে মুখ করা, ছোট-দাঁত, সোজা দাঁত প্রভৃতি।
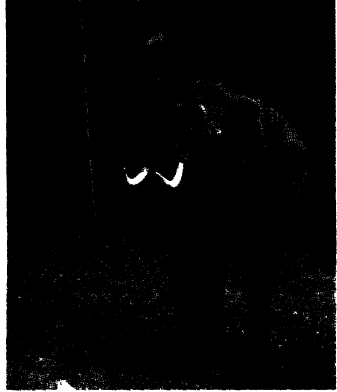
বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর পশ্চিমবাংলা, ওড়িষ্যা, বিহার উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতে হাতির বাস।

খাদ্য : ঘাস-পাতা, ফল, ধান, গম প্রভৃতি হাতির প্রিয় খাদ্য। পূর্ণ বয়স্ক একটি হাতি দিনে 250 থেকে 320 কিলো গ্রাম সবুজ ঘাসপাতা, গাছপালা খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

গণ্ডার

THE RHINOCEROS (*Rhinoceros unicornis*)

আকৃতি : পুরুষ ভারতীয় গণ্ডার সাধারণত 170 থেকে 180 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গণ্ডারের সারা দেহ মোটা বর্মের মতো চামড়ায় ঢাকা। চামড়ার উপর গুটি থাকে। নাকের উপর জমাট-বাঁধা লোমের শক্ত খর্গ আছে। আফ্রিকার গণ্ডারের দুটি খর্গ থাকে আর ভারতীয় গণ্ডারের একটি।

বাসস্থান : অসম ও উত্তর পশ্চিমবাংলা ছাড়া আর ভারতে গণ্ডার নেই।

খাদ্য : এদের প্রধান খাদ্য ঘাস।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বুনো গাধা

THE ASIATIC WILD ASS (*Equus hemionous*)

আকৃতি : উচ্চতায় 110 সে.মি. থেকে 120 সে.মি. এই জাতীয় গাধার গায়ের রঙ লালচে ধূসর। ঘাড়ের খয়েরি কেশর খাঁড়া হয়ে থাকে। লেজের গোড়া পর্যন্ত একটি গাঢ় খয়েরি দাগ (Stripe) রয়েছে। অন্যান্য ঘোড়া বা গাধা জাতীয় জন্তুর মতো এদের পায়েতে গোলাকৃতি ক্ষুর আছে।

বাসস্থান : কচ্ছের রান অঞ্চলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : কচ্ছের রান অঞ্চলে যে বেট্ ভূমি আছে, সেখানে খসখসে একধরনের ঘাস জন্মায়। এই ঘাসই গাধাদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ক্যায়ং গাধা

THE TIBETAN WILD ASS (*Equus hemionus kiang*)

আকৃতি : এশিয়ার বুনো গাধার থেকে এদের গায়ের রঙ গাড়তর ও আরো লালচে। পায়ের ক্ষুরগুলি ঘোড়ার মতো।

বাসস্থান : লাডাক অঞ্চলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : ঘাসই এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

গাউর

THE GAUR (*Bos gaurus*)

আকৃতি : পুরুষ গাউরের উচ্চতা 175 থেকে 195 সেন্টিমিটারের মধ্যে এবং এদের ওজন 800 থেকে 900 কিলো গ্রাম। স্ত্রী গাউরের উচ্চতা একটু কম। লালচে গাঢ় খয়েরি রঙের এই বিশাল প্রাণীটির কপাল ও পায়ের নীচের অংশ সাদা। মাথায় বিরাট শিং। এদের কাঁধে বড় কুঁজ আছে। আকৃতিতে এরা অনেকটা বড়সড় ষাঁড়ের মতো।

বাসস্থান : ভারতের প্রায় সবদিককার জঙ্গলেই গাউরের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : ঘাসপাতা এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ইয়াক

THE YAK (*Bos grunniens*)

আকৃতি : 170 থেকে 185 সেন্টিমিটার উচ্চতা ও এদের ওজন 550 কিলো গ্রামের কাছাকাছি। বিশিষ্ট ইয়াকের শরীর লম্বা লম্বা কালো নরম লোমে ঢাকা। এদের কাঁধে উঁচু কুঁজ আছে। সাধারণত এদের লেজে ও বুকে সাদা ছোপ আছে।

বাসস্থান : লাডাক অঞ্চলে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : তৃণভোজী প্রাণী বলে ঘাসই প্রধান খাদ্য। নুন যুক্ত মাটি এরা খায়।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বুনো মোষ

THE WILD BUFFALO (*Bubalus bubalis*)

আকৃতি : ওজনে বুনো মোষ 850 থেকে 900 কিলো গ্রামের কাছাকাছি হয়ে থাকে। 170 থেকে 200 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাণীটির মাথায় বিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিং থাকে। এদের গায়ের রঙ কালো।

কুশল মুখার্জী

বাসস্থান : একসময় এদেশের অনেক জঙ্গলেই এদের সন্ধান পাওয়া যেত। এখন শুধুমাত্র অসম আর মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এদের দেখা যায়।

খাদ্য : তৃণভোজী প্রাণী, সেইজন্য ঘাসই এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভরাল

THE BHARAL (*Pseudols nayaur*)

আকৃতি : প্রায় 90 সেন্টিমিটার উচ্চতায় এই প্রাণীটির মাথা আর পিঠের দিকের রঙ খয়েরি ধূসর। বাকি দেহ ধূসর নীলচে। শিং-এর মাপ প্রায় 58 থেকে 61 সেন্টিমিটার।

বাসস্থান : সিকিম কুমায়ুন ও লাডাক অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য : ঘাসই এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

মারখোর

THE MARKHOR (*Capra falconeri*)

আকৃতি : কালচে ধূসর রঙের লম্বা লম্বা লোম বিশিষ্ট মারখোর-এর মাথায় বিশাল প্যাঁচানো শিং আছে। উচ্চতায় 95 থেকে 100 সেন্টিমিটার।
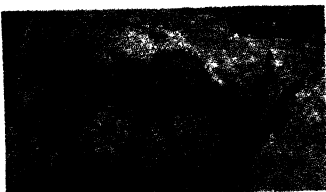
বাসস্থান : কাশ্মীর উপত্যাকায় এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য : ঘাসই প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হিমালয়ের থর

THE HIMALAYAN TAHR (*Hemitragus jemlahicus*)

আকৃতি : ছাগল জাতীয় এই প্রাণীটির সমস্ত শরীর খসখসে গাঢ় লালচে খয়েরি রঙের লোমে ঢাকা এবং এদের ওজন 90 কিলো গ্রামের কাছাকাছি। শিরদাঁড়ার মাঝামাঝি জায়গা থেকে গাঢ় লম্বা দাগ আছে। শিং দুটি ছোট আর কাছাকাছি। এদের কানদুটিও খাঁড়া ও কাছাকাছি। শিং দুটি সোজা উঠে পেছনদিকে বাঁকা।

বাসস্থান : হিমালয়ের পিরপাঞ্জাল থেকে সিকিম পর্যন্ত এদের দেখা যায়।

খাদ্য : অন্যান্য তৃণভোজীদের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

নীলগিরি থর

THE NILGIRI TAHR
(*Hemitragus hylocrius*)

আকৃতি : দাঁড়ানো অবস্থায় নীলগিরি থর 100 থেকে 110 সেন্টিমিটার। পেছনদিকে বাঁকা শিং-দুটি 40 থেকে 44

সেন্টিমিটার। হিমালয়ের থর থেকে এদের গায়ের লোম ছোট। এদের গায়ের রঙ হলদেটে খয়েরি ও পেটের দিকে হাল্কা।

বাসস্থান : নীলগিরি থেকে আন্নামালাই এবং দক্ষিণ পশ্চিমঘাটের 1220 থেকে 1830 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এদের বাস।

খাদ্য : অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সেরু

THE SEROW (*Capricornis sumatraensis*)

আকৃতি : দাঁড়ানো অবস্থায় সেরুর উচ্চতা 100 থেকে 110 সেন্টিমিটার এবং এদের ওজন 90 কিলো গ্রামের কাছাকাছি। এদের রঙ ধূসর কালো। ঘাড়, দুপাশ ও উরুর নীচের ভাগ লালচে। শরীরের ভেতরের দিক ও পেট ধূসর। এদের মাথা বড় ও কান খাঁড়া।

বাসস্থান : কাশ্মীর থেকে অরুণাচলের মিসমি পাহাড়ে 1850 থেকে 3000 মিটার উচ্চতায় এদের বাস।

খাদ্য : খাবার অভ্যাস অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

গোরাল

GORAL (*Nemorhaedus goral*)

আকৃতি : উচ্চতায় প্রায় 70 সে.মি. এই প্রাণীটির মাথায় 13 সে.মি. শিং আছে এবং ওজন 25 থেকে 30 কিলো গ্রাম। মোটামোটা এই প্রাণীটির চেহারার সঙ্গে ছাগলের মিল আছে। গায়ে খসখসে লোমে ভরা।

ঘাড়ের কাছে লোমের গুচ্ছ আছে। এদের শরীরের রঙ হলদেটে ধূসর। উপরের ঠোঁটে চোয়ালের নীচের দিকে ও গলায় সাদা ছোপ রয়েছে।

বাসস্থান : ভারতে গোরালের দুটি উপপ্রজাতি আছে। একটি কাশ্মীর ও পশ্চিম হিমালয়ের ও আরেকটি উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের। কাশ্মীর প্রজাতিটির ছাইরঙের শরীর। 1000 মি. থেকে 3000 মি. উচ্চতায় এদের সন্ধান মেলে। তবে এরও উপরে কখনো, কখনো এদের দেখা যায়।

খাদ্য : পাহাড়ি ঘাস এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল তালিকাভুক্ত প্রাণী।

আইবেক্স *(বাংলায় নাম পাওয়া যায় না।)*

THE IBEX (*Capra ibex*)

আকৃতি : হৃষ্টপুষ্ট এই পাহাড়ি ছাগলটির উচ্চতা 100 সেন্টিমিটার এবং এদের ওজন 75 থেকে 90 কিলো গ্রাম। পুরুষটির দাড়ি আছে। শীতকালে এদের গায়ে হলদেটে সাদা রঙের পুরু লোম হয়। এদের শিংদুটি বেশ বড়; প্রায় 140 থেকে 185 সেন্টিমিটার মতো লম্বা।

বাসস্থান : পশ্চিম হিমালয়ে এদের বাস।

খাদ্য : অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

কৃষ্ণসার

BLACK BUCK (*Antilope cervicapra*)

আকৃতি : কৃষ্ণসার হরিণের উচ্চতা প্রায় 80 সেন্টিমিটার। ওজনে পুরুষ প্রাণীটি প্রায় 40 কিলো গ্রাম। মাথার উপর প্রায় সমান্তরাল উঠে গেছে দুটি পাকানো শিং। মাথা গলা, পিঠ, বুকের পাশ ও পায়ের পাতার দিক কালো আর পায়ের ভেতরের অংশ

এবং গলার নীচ থেকে পেট সাদা। লেজের চারপাশটা সাদা তবে লেজটি কালো। চোখের চারপাশে আর ঠোঁটের উপর দিয়ে সাদা। স্ত্রী-কৃষ্ণসারের পিঠ বাদামি।

বাসস্থান : দক্ষিণের উপকূল ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষেই কৃষ্ণসার হরিণ দেখা যায়।

খাদ্য : অন্যান্য হরিণদের মতোই।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

চিঙ্কারা

CHINKARA (*Gazella gazella*)

আকৃতি : পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ চিঙ্কারা উচ্চতায় 65 সেন্টিমিটার ও ওজনে 25 কিলো গ্রাম। এদের শিং-দুটি বেশ কিছুটা সমান্তরাল ভাবে ওঠবার পর পেছনদিকে সামান্য বেঁকে আবার একদম শেষে সামনের দিকে বাঁকা। গায়ের রং হলদেটে। পেটের দিকে রং প্রায় সাদা। লেজের চারধারে কালো রিং-এর মতো। কিন্তু ভেতরের দিকটা সাদা।

বাসস্থান : দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্যভারত এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : অন্যান্য হরিণের মতোই।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

চৌশিঙ্গা

FOUR-HORNED ATELOPE (*Tetracerus quadricornis*)

আকৃতি : 65 সে.মি. উঁচু এই প্রাণীটির ওজন প্রায় 25 কিলো গ্রাম। এদের মাথার সামনের দিকে দুটি ছোট এবং পেছন দিকে অপেক্ষাকৃত বড় দুটি শিং আছে। গায়ের রঙ খয়েরি, মুখে নীচ থেকে গলা হয়ে পেটের দিকটা সামান্য হাল্কা।

বাসস্থান : উত্তর, মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণভারতে এদের দেখা মেলে। কিন্তু মালাবার উপকূলে এরা অনুপস্থিত।

খাদ্য : ঘাসই এদের প্রিয় খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

নীলগাই

NILGAI (*Boselaphus tragocamelus*)

আকৃতি : কিছুটা ঘোড়ার মতো আকৃতির এই প্রাণীটির পেছন দিকটা সামনের দিকের থেকে একটু নিচু। উচ্চতায় 140 সেন্টিমিটার-এর কাছাকাছি। শরীর ছোট, ছোট লোমে ভরা। পুরুষ নীলগাইয়ের গায়ের রঙ নীলচে আর গলায় দাড়ির মতো লম্বা, লম্বা লোম আছে। স্ত্রী নীলগাই-এর রঙ হলদেটে খয়েরি। তবে উভয়ের পায়ের ক্ষুরের উপরের দিকে সাদা দুটি ব্যান্ড আছে।

বাসস্থান : পশ্চিমবাংলা, উত্তর-পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ ভারত ছাড়া প্রায় সর্বত্রই নীলগাই পাওয়া যায়।

খাদ্য : গাছের পাতা, ফল এদের খাদ্য। মহুয়ার ফুল এদের প্রিয়। এরা উত্তরভারতে খেতের ফসল ক্ষতি করে।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

হাঙ্গুল

HANGUL (*Cervus elaphus hanglu*)

বরুণ রায়

আকৃতি : পুরুষ হাঙ্গুল উচ্চতায় 125 সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এদের ওজন 160 থেকে 180 কিলো গ্রাম। হাল্কা থেকে গাঢ় খয়েরি রঙের শরীরে ঠোঁট, চিবুক, পেট ও পেছনদিকের রং সাদাটে। শীতকালে রঙ গাঢ়তর হয়। সাধারণত এদের শিঙে 12 থেকে 15 টি শাখা থাকে।

বাসস্থান : কাশ্মীরে দাচিগাম ছাড়া আর কোথাও হাঙ্গুল পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে হাঙ্গুলেরা পাহাড়ের অনেক উপর উঠে যায়।

খাদ্য : অন্যান্য হরিণের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সাংগাই বা নাচুনে হরিণ

THAMIN OR BROW-ANTIERED DEER (*Cervus eldi*)

আকৃতি : 125 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট পুরুষ সাংগাই-এর মাথার শিং দুটি প্রায় 110 সেন্টিমিটার উঁচু। সাংগাই-এর পেছনদিকটা কিছুটা ঢালু এদের শিং-এ ছটি/আটটি শাখা থাকে। পুরুষ প্রাণীটির রঙ কালচে খয়েরি। পেছনদিকটা কিছুটা হাল্কা। গায়ের লোমগুলি খসখসে।

বাসস্থান : মনিপুরের কৈবিল লামজাও ছাড়া আর কোথাও এদের দেখা মেলে না।

খাদ্য : জলজ উদ্ভিদ, শ্যাওলা ইত্যাদি এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

চিতল হরিণ

SPOTTED DEER (*Axix axis*)

আকৃতি : উচ্চতায় পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতল হরিণ 90 সে.মি. আর ওজন 80 থেকে 90 কে.জি। এদের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গায়ের রঙ তামাটে আর তার উপর স্পষ্ট সাদা গোল, গোল ছাপ আছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ চিতলের রঙ গাঢ় বাদামি হয়ে যায়। পুরুষ হরিণের মাথার শিং বেশ বড় আর ডাল-পালা ছড়ানো, স্ত্রী-হরিণের শিং নেই।

বাসস্থান : সমস্ত ভারত জুড়েই এদের দেখতে পাওয়া যায়। কানহা, করবেট প্রভৃতি জঙ্গলে একসঙ্গে তিন-চারশো হরিণের দলও চোখে পড়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে।

খাদ্য : ঘাস-পাতা, লতা-গুল্ম সবই এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সম্বর

SAMBAR (*Cervus unicolor*)

আকৃতি : পূর্ণবয়স্ক সম্বর উচ্চতায় 5 ফুটের কাছাকাছি। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হরিণের ওজন প্রায় 225 থেকে 300 কিলো গ্রাম। পুরুষের মাথার শিং-দুটি ডালপালা ছড়ানো ও বড়। স্ত্রী প্রাণীটির শিং নেই। এদের গায়েররঙ হাল্কা থেকে গাঢ় ধূসর। গরম কালে

এদের ঘন লোম কিছুটা ঝরে যায়। এরা জলে শরীর ডুবিয়ে থাকতে পছন্দ করে।

বাসস্থান : ভারতের প্রায় সব জঙ্গলেই এদের দেখা যায়। তবে চিতলের মতো অত বড় দলে এরা থাকে না। 8-10টির দল সাধারণত চোখে পড়ে। মার্চ-এপ্রিলে এদের শিং খসে যায়।

খাদ্য : চিতল হরিণের মতোই এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

কাকার হরিণ

BARKINGDEER MUNTJAK (*Muntiacus muntjak*)

আকৃতি : 45 থেকে 75 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কাকার হরিণের মাথায় দুটি ছোট ছোট সোজা শিং আছে। চোখের উপর থেকে কপাল পর্যন্ত দুটি কালো রঙের লম্বা দাগ স্পষ্ট। মে-জুন মাস নাগাদ এদের মাথার শিং খসে যায়। কাকার হরিণের গায়ের রঙ উজ্জ্বল খয়েরি।

বাসস্থান : প্রায় সমস্ত ভারতেই কাকার হরিণ আছে। প্রতিবেশী দেশ চিন, তাইওয়ান, জাপান ও মায়ানমারেও এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : চিতল হরিণের মতো।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

পাড়া হরিণ

HOG DEER (*Axix porcinus*)

আকৃতি : পাড়া হরিণের উচ্চতা 60 সে.মি.-এর মতো এবং ওজন 50 কিলো গ্রামের কাছাকাছি। এদের গায়ের রঙ হাল্কা হলদেটে খয়েরি। এদের কানের ও লেজের ভেতরের অংশ সাদাটে। লোমের

একেবারে আগার দিকটা সাদা। দৌড়োবার সময় এরা মাথা নিচু করে দৌড়ায়, হয়তো এই জন্য ইংরাজিতে ওদের Hog deer বলা হয়। এদের শিং দুটি ছোট, কিন্তু একেবারে উপরের দিকে দুটি ভাগে ভাগ করা।

বাসস্থান : দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের অন্যান্য জঙ্গলে এদের দেখা পাওয়া যায়।

খাদ্য : চিতল হরিণের মতোই।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

কস্তুরী হরিণ

MUSK DEER (*Moschus moschiferus*)

আকৃতি : এরা উচ্চতায় 50 সেন্টিমিটার-এর কাছাকাছি। এদের মাথায় শিং নেই। এদের লেজটি প্রায় দেখাই যায় না। লম্বা, লম্বা লোমে লেজের কাছটি ঢাকা। মুখের দুদিকে দুটি সোজা গজদাঁত আছে, যা মুখের বাইরে থেকে স্পষ্ট। অন্যান্য হরিণ প্রজাতির মতো এদের মুখে কোন গ্রন্থী (gland) নেই। গ্রন্থীটি পিত্তথলির মধ্যে থাকে। পুরুষ হরিণটির পেটের ভেতর একরকমের গন্ধযুক্ত গ্রন্থি থাকে, যা থেকে মানুষের ব্যবহার্য সুগন্ধি তৈরি হতে পারে। তাই এদের কস্তুরী হরিণ নাম। কস্তুরীর জন্যে উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

বাসস্থান : উত্তর-পূর্ব ভারত ও হিমাচল প্রদেশে এদের দেখা যায়। কাশ্মীর, নেপাল ও সিকিমে অন্য আরেক উপজাতির কস্তুরী হরিণের সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : চিতল হরিণের মতোই।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

বারশিঙ্গা

(*Cervus duvauceli*)

আকৃতি : এই বিশেষ ধরনের হরিণটির উচ্চতা প্রায় 140 সেন্টিমিটার। হলদেটে খয়েরি থেকে গাঢ় খয়েরি রঙের এই হরিণটির ওজন 150 থেকে 180

কিলো গ্রাম। পুরুষ প্রাণীর গলার কাছে লম্বা, লম্বা লোম থাকে। পুরুষ বারশিঙ্গার শক্তিশালী উঁচু শিঙের উপরের দিকে 10 থেকে 15 টি শাখা থাকে।

বাসস্থান : মধ্য প্রদেশের অনেক জায়গাতেই আগে এই প্রাণীটির সন্ধান মিলত। এখন একমাত্র কানহার বনভূমিতেই এরা সীমাবদ্ধ। অসম ও উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এদের আরেক উপপ্রজাতি *C. Branderi*-র সন্ধান পাওয়া যায়।

খাদ্য : বিশেষ ধরনের জলাভূমির ঘাস ও উদ্ভিদ এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-1 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সাধারণ কাঠবিড়ালী

FIVESTRIPED PALM SQUIRREL (*Funambulus pennanti*)

আকৃতি : মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সাধারণ কাঠবেড়ালীর দৈর্ঘ্য 27 সেন্টিমিটার-এর কাছাকাছি। এদের পীঠে পাঁচটি লম্বা দাগ থাকে দেহের প্রায় সমপরিমাণ লেজটির রঙ ছাই।

বাসস্থান : সর্বত্রই এদের দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি শহরাঞ্চলেও এদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

খাদ্য : বাদাম, ফল, ফুলের মধু, পাখীর ডিম, পোকামাকড় এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-3 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

ভারতে আরো এক রকমের বড় কাঠবেড়ালী আছে। এরা হল Grizzled Squirrel (R. maroura)। উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের দেখা মেলে।

ডোরাকাটা কাঠবেড়ালীরও আরো এক প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। এরা তিন ডোরাওয়ালা কাঠবেড়ালী বা Three striped Squirrel (F. palmarum)

ভারতীয় বড় কাঠবিড়ালী

INDIAN GIANT SQUIRREL (*Ratufa indica*)

আকৃতি : এদের মাথা থেকে লেজের মাপ প্রায় 100 সেন্টিমিটার। মাথার উপরের দিক থেকে পীঠের উপরিভাগ গাঢ় বাদামী আর পেট সাদা। লেজ বেশ বড়, মোটা আর কালচে বাদামি।

বাসস্থান : গাঙ্গেয় দক্ষিণ ভাগ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারত জুড়ে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য : গাছের ফল, পাতা এদের খাদ্য।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

মালয়ের বড় কাঠবিড়ালী

MALAYAN GAINT SQUIRREL (*Ratufa bicalor*)

আকৃতি : এদের মাথা থেকে শরীরের উপরের অংশ গাঢ়, প্রায় কালচে বাদামী, লেজ কালো। পেটের নীচের অংশ হলদেটে সাদা। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এদের দৈর্ঘ্য প্রায় 100 সেন্টিমিটার।

বাসস্থান : উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্ব বনাঞ্চল জুড়ে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য : ভারতীয় কাঠবেড়ালীর মতই।

সাংরক্ষণিক মর্যাদা : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর তপশীল-2 তালিকাভুক্ত প্রাণী।

এছাড়াও আমাদের দেশে কয়েক ধরনের মাঝারি কাঠবেড়ালীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হল, উত্তর-পূর্ব ভারতের Orangebellied Himalayan Squirrel (*Dremomys lokriah*) এবং Hoarybellied Squirrel (*Callosciurus pygerythrus*) ভারতে এগারো প্রজাতির উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী বা Flyms squirrel এর সন্ধান পাওয়া যায়, এরা হল Common Gaint Squirrel (*Petaurista petanrista*), Large Brown Squirrel (*P. philippensis*), Red fly Squirrel (*P albiventer*), Hodgson's flying squirrel (*P. magnificus*), Kashmir Woolly Flying Squirrel (*Eupetanrus cinereus*) প্রভৃতি।

4

ভারতের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য

অরুণাচল প্রদেশ

ইটানগর অভয়ারণ্য

1978 সালে সরকারিভাবে 140 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে ঘোষিত হয়েছে ইটানগর অভয়ারণ্য — অবশ্য পরে জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃত। চিরহরিৎ বনের বিশিষ্টতা নিয়ে এ অভয়ারণ্য, বাঘ ও বুনো হাতির আবাসস্থল। ইটানগর অভয়ারণ্যের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি প্রায় চার হাজার ফুট। হিমালয়ের নানান প্রজাতির পাখির দেখাও মেলে এখানে।

অভয়ারণ্যের মধ্যে তিনটি বন বিভাগের রেস্ট হাউস রয়েছে — সেগুলিতে রাত্রিবাসের অনুমতির জন্য ডেপুটি চিফ ওয়াইল্ড লাইফ অরুণাচল, পো: নহর, অরুণাচল 79110, আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। অভয়ারণ্য ভ্রমণের উপযুক্ত সময় অক্টোবর থেকে এপ্রিল। অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর ও রাজ্যের রাজধানী ইটানগর অভয়ারণ্য থেকে মাত্র 15 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত। নিকটবর্তী রেল স্টেশন হামাতি অভয়ারণ্য থেকে 22 কিলো মিটার দূরে।

নামদাফা ব্যাঘ্র প্রকল্প

1972 সালে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত নামদাফা, ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের সদস্য হয়েছে 1983 সালের মার্চ মাস নাগাদ। নামদাফা এখন জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষিত।

নামদাফা নদীর নামেই জাতীয় উদ্যানের নাম। নদীর জন্মস্থল 'ডাফাবুম' নামে চার হাজার পাঁচশো মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি পাহাড়ের চূড়া — যেটি এ জাতীয় উদ্যানের উচ্চতম স্থান। জাতীয় উদ্যানের মোট আয়তন 1,808 বর্গ কিলোমিটার ও এটি অরুণাচল জেলার চাংলাং জেলায় অবস্থিত। নামদাফা পৃথিবীর জাতীয় উদ্যান মানচিত্রে অনন্য;

প্রাকৃতিক, সৌন্দর্য্যে ঘেরা নামদাফার বনবিশ্রাম গৃহ।

কারণ পৃথিবীর অন্য কোনও জাতীয় উদ্যানের উচ্চতার তারতম্য নামদাফার মতো এত বেশি নয় — দুশো মিটার থেকে চার হাজার পাঁচশো মিটার। তাই স্বাভাবিক কারণেই বন ও বন্যপ্রাণীর সমৃদ্ধির তারতম্যেও অনন্য। নোয়া ডেহিং নামক নদীটি জাতীয় উদ্যানের বুক চিরে বয়ে চলেছে। অন্যান্য কয়েকটি শাখা নদী হল ডেবান, নামদাফা, মপেন ও বর্মা নালা। ক্রান্তীয়, আর্দ্র, চিরহরিৎ, শুষ্ক মিশ্র পর্ণমোচী ও উচ্চ পার্বত্য বন সবগুলিই রয়েছে নামদাফা জাতীয় উদ্যানে — যার তুলনা পাওয়া কঠিন। উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী বিজ্ঞানীদের স্বপ্নের স্বর্গ এ নামদাফা। উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার জীবন্ত বীক্ষণাগার। এই আদিম জঙ্গলে বিপন্ন বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে — বাঘ (Tiger), চিতাবাঘ (Leopard), তুষার চিতা (Snow Leopard), আমচিতা (Clouded Leopard), চিতাবেড়াল (Leopard), বনবেড়াল (Jungle Cat), বাঘরোল (Fishing Cat) প্রভৃতি। তা ছাড়া রয়েছে উল্লুক (Hoolock Gibbon), হাতি, গাউর, সম্বর (Sambar), পাড়া হরিণ (Hog Deer), কাকার (Barking Deer), গোরাল (Goral), মিশমি টাকিন (Mishmi Takin), কালো ভাল্লুক (Himalayan Black Bear), লাল পান্ডা (Lesser Panda), লজ্জাবতী বানর (Slow Loris), অসমীয়া বানর, হ্রস্বপুচ্ছ বানর (Stumptailed macaque)। পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Whitecrested Laughing Thrush, Black Gorgetted Laughing Thrush, Himalayan Roller, Maroon Oriole, White Winged Woodduck, (এদের কারো বাংলা নাম পাওয়া যায় না)। এছাড়া আছে পাঁচ প্রজাতির ধনেশ। নামদাফার প্রায় 350 প্রজাতির পাখির সন্ধান পন্দাওয়া যায়।

নামদাফা বনাঞ্চলের জীববিদ্যার রূপ রহস্য এখনও পুরোপুরি উদঘাটিত হয়নি। তাই বিভিন্ন দেশ-বিদেশের জীববিজ্ঞানীরা প্রকৃতির এ গবেষণাগারে আসেন রহস্য উন্মোচনের তাগিদে। এই উদ্যান পরিক্রমা করতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কোনো বাহন (হাতি ছাড়া) অর্থাৎ গাড়ি নিয়ে ঢোকা নিশিদ্ধও গাড়ি চলার উপযোগী রাস্তা নেই। সেই কারণেই হয়তো নামদাফা জাতীয় উদ্যানে পর্যটন এখনও বিশেষ জমে উঠেনি।

নামদাফা ভ্রমণের ভাল সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। নামচিক মি-আও ও দেবানে বনবিভাগের তিনটি সুন্দর বিশ্রামগৃহ রয়েছে যেগুলি বুকিংয়ের জন্য 'ফিল্ড ডাইরেক্টর', প্রোজেক্ট টাইগার, নামদাফা, পো: মি-আও, জিলাঃ চাংলাং, অরুণাচল প্রদেশ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। নিকটবর্তী রেল স্টেশন লিডো 56 কিলো মিটার ও নিকটবর্তী বিমানবন্দর ডিব্রুগড় প্রায় 163 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

বেশ কিছু নজর মীনারও (ওয়াচ টাওয়ার) রয়েছে এ জাতীয় উদ্যানে যেখান থেকে পর্যটকরা নামদাফার অবিকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

লালি অভয়ারণ্য

1978 সালে সরকারিভাবে ঘোষিত হয় লালি অভয়ারণ্য। 190 বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল নিয়ে এ অভয়ারণ্য। এ অভয়ারণ্যে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে নরমজমির বারশিঙ্গা হরিণ ও বুনো মোষ।

অভয়ারণ্যের পর্যটন ব্যবস্থা এখনও ভালভাবে গড়ে উঠেনি। অভয়ারণ্যে বনবিভাগের একটি বিশ্রামাগার রয়েছে কয়েকটি উঁচু নজর মীনার আছে যেখান থেকে পর্যটকরা বন ও বন্যপ্রাণী দেখতে পারেন। অভয়ারণ্য প্রবেশের অনুমতি পত্রের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ডলাইফ, পো: পাসিঘাট, জিলা: ইস্ট সিয়াং, অরুণাচল প্রদেশ 7911021-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। নিকটবর্তী শহর পাসিঘাট 16 কিলো মিটার দূরে। নিকটবর্তী রেল স্টেশনটি 36 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

মেহাও স্যাংচুয়ারি

1980 সালে সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে মেহাও অভয়ারণ্য। এ অভয়ারণ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যাধিক। বার্ষিক পরিমাণ প্রায় 419 সেন্টিমিটার। এ অভয়ারণ্যের উচ্চতার তারতম্যও উল্লেখযোগ্য। মাত্র চারশো মিটার উচ্চতা থেকে প্রায় 3,500 মিটার উচ্চতা অবধি এ অভয়ারণ্যের ব্যাপ্তি। তাই স্বাভাবিক কারণেই বন ও বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যে এ অভয়ারণ্য বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। অভয়ারণ্যের বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি সম্পদের মধ্যে রয়েছে আম চিতা (Clouded Leopard), উল্লুক (Hoolock Gibbon), চিতা

বেড়াল (Leopard Cat), কস্তুরী মৃগ (Musk Deer), বাঘদোস (Spotted Linsang), এবং নরম জমির বারশিঙ্গা হরিণ (Swamp Deer) ও বাঘ (Tiger)। হিমালয়ের মোনাল থেকে শুরু করে অজস্র প্রজাতির পাখির স্বর্গ এই অভয়ারণ্য।

বন ও বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্য মেহাও অভয়ারণ্যের এক বিশিষ্ট অবদান আছে। তাই এ অভয়ারণ্যটি পর্যটকদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে যদি এখানকার পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হয়। পর্যটনের ভাল সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। অভয়ারণ্যে প্রবেশের অনুমতি ও বিশ্রামগার বুকিংয়ের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ওয়াইল্ড লাইফ, পো: রোয়িং, জিলা: ডিবাং ভ্যালি। এখানে বনবিভাগের 5টি সুন্দর বিশ্রাম নিবাস রয়েছে। নিকটবর্তী শহর ও রেল স্টেশন যথাক্রমে রোয়িং (10 কিলো মিটার), তিনসুকিয়া (120 কিলোমিটার)। মিশমি পাহাড়ের প্রকৃতি পর্যটকদের কাছে টানবেই। রোয়িং-এ ডিব্রুগড় থেকে সপ্তাহে দু'দিন হেলিকপ্টার যাতায়াত করে। তবে নিকটতম বিমানবন্দর ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড় থেকে সড়কপথেও এখানে যাওয়া যায়।

পাখুই অভয়ারণ্য

1977 সালে পাখুই সরকারিভাবে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত হয়। ডাফলা পাহাড়ের 862 বর্গকিলোমিটার মিশ্র অরণ্য নিয়ে পাখুই অভয়ারণ্যের আয়তন। বন ও বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যের অপূর্ব সম্ভার রয়েছে পাখুই অভয়ারণ্যে। এখানে দেখতে পাওয়া যায় বুনো হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক (Sloth Bear), লজ্জাবতী বানর (Snow Loris) ও অপূর্ব রঙ বেরঙের পাখির সমারোহ। আর দেখতে পাবেন আদিম বনের ঘন বিস্তার — যেখানে দিনের বেলায় রাতের অন্ধকার নেমে আসে।

পর্যটনের সুবিধার জন্য এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি উঁচু নজর মীনার (Watch Tower) ও রাত্রি বাসের জন্য চারটি সুন্দর বনবিভাগের বিশ্রামাগার। অভয়ারণ্যে প্রবেশ ও রাত্রি বাসের জন্য বিশ্রামাগারে থাকার অনুমতির জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, পাখুই ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, পো: সিপ্রে, জিলা: ইস্ট কামেং, অরুণাচল প্রদেশ-এর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায়াজন। অভয়ারণ্যে নিকটবর্তী শহর ও বিমানবন্দর তেজপুর অভয়ারণ্য থেকে 65 কিলো মিটার দূরে। আর নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাঙাপাড়া নর্থ অভয়ারণ্য থেকে 52 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

অসম

মানস অভয়ারণ্য

উত্তর-পূর্ব ভারতে অসম রাজ্যে, ভারত-ভুটান সীমানায়, মানস নদীকে ঘিরে হিমালয়ের পাদদেশে বিরাজ করছে তরাই ও ভাবর-এর এক সুবিশাল বনভূমি। এই বনভূমি যেমন বন্যপ্রাণী ও পাখিতে সমৃদ্ধ, তেমনই আকর্ষণীয় তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। 1928 সালে এই জঙ্গলের সামান্য কিছুটা অংশ নিয়ে ঘোষিত হয়েছিল 'মানস অভয়ারণ্য'। বর্তমানে এই অভয়ারণ্যটির বাফার আয়তন 2,840 বর্গ কিলো মিটার, মূল অভয়ারণ্য 500 বর্গ কিলো মিটার। 1973 সালে মানসকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনে আনা হয়। গৌহাটি থেকে 145 কিলো মিটার দূরের শহর বরপেটা রোড থেকে মানস অভয়ারণ্যের দূরত্ব মাত্র 41 কিলো মিটার। কলকাতা থেকে সরাসরি কামরূপ এক্সপ্রেসে বরপেটা রোড পৌঁছানো যায়। বরপেটায় জীপ ভাড়া পাওয়া যায় মানস যাবার জন্য। মানস Heritage Site-এর অন্তর্ভুক্ত।

এই জঙ্গলের উত্তরে ভুটান এবং দক্ষিণে অসম রাজ্য। পশ্চিমে এই বনভূমি মিশেছে পশ্চিম বাংলায়। অভয়ারণ্যের বুক চিরে বয়ে চলেছে মানস নদী আর তার দুই শাখানদী 'বেঁকী' ও 'হাকুয়া'। মাথানগুরিতে মানস নদীই সৃষ্টি করেছে ভারত ও ভুটানের মধ্যে সীমারেখা।

পর্যটক নিয়ে হাতি চলেছে গভীরে, মানসের জঙ্গলে।

এই অভয়ারণ্যটিতে প্রধানত দু'ধরনের জঙ্গলের সন্ধান মেলে। প্রথমটি 'ভাবর' অঞ্চল, সেখানকার ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ ও পাথুরে এবং অপর অঞ্চলটি 'তরাই' এর গভীর ও সবুজ বনাঞ্চল। এই জঙ্গলের দক্ষিণে নদীর পাড় ভরে আছে গোল গোল নুড়ি পাথরে। আর আছে ঘাসের বিস্তীর্ণ সমতল ভূ-ভাগ, যা গিয়ে মিশেছে ভুটানের পাহাড়ের পাদদেশে।

ভারতের দিকের বনভূমি প্রধানত পর্ণমোচী এবং তার ফাঁকে ফাঁকে বিরাজ করে সবুজ ঘাসের ভূ-ভাগ।

মানসে মৌসুমী বায়ুর স্থায়িত্ব দীর্ঘ, ফলে বৃষ্টিপাতেরও আধিক্য রয়েছে। সাধারণত মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে বর্ষাকাল।

এই বনভূমিতে প্রধানত যেসব গাছের দেখা মেলে সেগুলি হল, কাঞ্চন, শিমূল, বাদাম, আমলকি, খয়ের প্রভৃতি। নীচের দিকে শালের বন। এছাড়া আছে বড় বড় ঘাসের বিস্তৃত অঞ্চল।

বন্যপ্রাণী, বিশেষত ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্যে মানস গর্ব করতে পারে। ছোট প্রাণীর মধ্যে এখানে আছে Pygmy Hog, Mouse Deer, Hispid Hare, মালয়ের বড় কাঠবেড়ালি (Malayan Gaint Squirrel), ছাই রঙা কাঠবেড়ালি (Hoary Bellied Squirrel), চিতা বেড়াল প্রভৃতি। মানসে দেখা পাওয়া যায় কয়েক প্রজাতির দুর্লভ বন্যপ্রাণীর, যেমন Binturong ও আমচিতা (Clouded Leopard)। এখানকার বিশেষ আকর্ষণ 'সোনালী হনুমান' (Golden Langur)। এরা দল বেঁধে থাকে সাধারণত ভুটানের দিকে। এছাড়া মানস অভয়ারণ্যে আছে দুষ্প্রাপ্য Capped Langur। এছাড়া অন্যান্য যেসব প্রাণীর এখানে দেখা পাওয়া যাবে, সেগুলির মধ্যে আছে বাঘ (Tiger), চিতাবাঘ (Leopard), হাতি (Elepahant), গণ্ডার (One-horned Rhino), বুনো শুয়োর (Wild Pig), অসমের বানর (Assamese Macaque), বেজী (Common Mongoose), শজারু (Porcupine), শেয়াল (Jackal), বুনো মোষ (Water Buffalo) প্রভৃতি। আর এই জাতীয় বুনো মোষের শেষ আশ্রয়স্থল মানস, কাজিরাঙ্গা ও মধ্যপ্রদেশের বাস্তার। নদীর কাছাকাছি দেখা যায় ভোঁদড় (Ottar)। নানান জাতের কচ্ছপ আর বিভিন্ন প্রজাতির গোসাপ সাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ময়াল সাপ (Indian Rock Python)। মোট ২০ প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল মানসের এই বনভূমি।

বন্যপ্রাণীর মতো পাখির জন্যেও মানস গর্ববোধ করতে পারে। পাখির মধ্যে 'বেঙ্গল ফ্লোরিকান' (Bengal Florican), 'লিখ' (Leekh), 'কালিজ' (Grey Kalij), 'নওরং' (Indian Pitta) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এখানে দেখা মেলে বড়কাও ধনেশ (Great Indian Hornbill), ছোটকাও ধনেশ (Indian Pied Hornbill), ছোট ধনেশ (Grey Hornbill), গগনবেড় (Grey Pelican), মানিক জোড় (Whitenecked stork),

লোহাজাং (Blacknecked strok) ও সোনাজাং (Painted stork), লটকান (Lorikeet), লালগির্দি (White Capped Redstart), হলুদমাথা ও সাদাকালো খঞ্জন (Wagtail), কালোমাথা হলুদ বুলবুলি (Blackheaded Yellow Bulbul), কেশরাজ (Haircrested Drongo), ফিতে বুলবুল ও রামগাংরা (Tit), কালো তিতির, ময়ূর প্রভৃতি। শিকারি পাখির মধ্যে আছে 'স্প্যারো হক্ (Sparrow Hawk), সারপ্যান্ট ঈগল (Serpent Eagle), শিক্‌রা (Sikra), তুরুম্‌তি (Merlin), মৌবাজ প্রভৃতি। শীতের সময় মানস আর বেঁকির জলে উড়ে আসে নীলশির (Mallard), চখাচখি (Ruddy Shelduck), সরাল (Whistling Teal), পানকৌড়ি (Cormorant), রাজহাঁস (Greylag Goose) প্রভৃতি যাযাবর পাখির ঝাঁক।

মানসের জলে মহাশির, রুই প্রভৃতি মাছ আছে।

এখানে ঘোরবার জন্যে বনদপ্তরের হাতি পাওয়া যায়। ভোরে ও বিকেলে হাতির পিঠে জঙ্গলে প্রবেশ করা যায়। রাস্তা বলতে মোটামুটি একটাই কাঁচা রাস্তা চলে গেছে গভীর, উঁচু উঁচু ঘাসের জমির ভেতর দিয়ে।

ভারতের দিকে 'মাথান্‌গুড়ি'-তে বাংলো আছে। মাথান্‌গুড়ি বাংলোর বারান্দা থেকে মানসের এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। ওপারে ভূটানে যাবার জন্যে নদীতে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। মাথান্‌গুড়িতে থাকবার অনেকরকম ব্যবস্থা আছে। নদী পেরিয়ে ভূটানে রয়েছে মহারাজার বাড়ি, যা এখন পর্যটন আবাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল।

বুকিং-এর জন্যে লিখতে হবে, ফিল্ড ডাইরেক্টর, মানস টাইগার রিজার্ভ, বরপেটা রোড, অসম।

কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান

এই শতকের গোড়ার দিকে একশৃঙ্গী গন্ডারের সংখ্যা যখন কমতে কমতে মাত্র বারোতে এসে দাঁড়ায়, ঠিক সেই শেষ মুহূর্তে, 1908 সালে কাজিরাঙ্গার জঙ্গলকে ঘোষণা করা হয় 'সংরক্ষিত বন' হিসাবে। এরপর 1940 সালে কাজিরাঙা লাভ করে অভয়ারণ্যের শিরোপা এবং 1974 সালে এই 430 বর্গ কিলোমিটারের জঙ্গলটিকে প্রদান করা হয় জাতীয় উদ্যানের সম্মান। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় এই বনভূমি এখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় উদ্যান।

নিকটতম রেল স্টেশন ও এয়ারপোর্ট জোড়হাট থেকে কাজিরাঙার দূরত্ব 95 কিলো মিটার। জোড়হাট ও কাজিরাঙার মধ্যে নিয়মিত বাস চলাচল করে।

কাজিরাঙা প্রধানত উঁচু উঁচু ঘাসের বিশাল সমতলভূমি। অবশ্য মাঝে মাঝে রয়েছে চিরহরিৎ গাছপালা। ব্রহ্মপুত্রকে একদিকে যেমন বলা যায় কাজিরাঙার
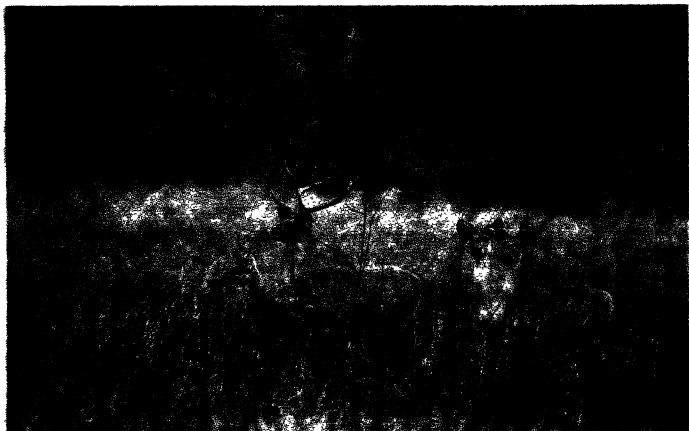
দেবল সেন

বারশিঙ্গা হরিণের নিশ্চিন্ত বাসস্থান কাজিরাঙার উঁচু ঘাসের সমতলভূমি।

অভিশাপ, অন্যদিকে আশীর্বাদও বটে। ব্রহ্মপুত্রে যখন বন্যা হয়, কাজিরাঙার বনভূমির প্রায় সবটাই চলে যায় জলের তলায়। ভেসে যায় বেশ কিছু হরিণ আর ছোট প্রাণী। এমনকী গন্ডারের মতো বিশাল প্রাণীরও মৃত্যু ঘটে। বন্যার সঙ্গে সঙ্গে কাজিরাঙার বন্যজন্তুর পাল আশ্রয় গ্রহণ করে মিকির পাহাড়ে অথবা দারাং জেলায়। বন্যার পর যখন জল আবার সরে যায় কাজিরাঙা তখন ভরে যায় সবুজ কচি ঘাসে, নানান জাতের গুল্মো, লতা-পাতা প্রভৃতিতে। সেই সময় হাতির পিঠে বসে বা জীপের উপর দাঁড়িয়ে খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায় নিশ্চিন্তে চরে বেড়ানো এক শৃঙ্গী গন্ডার আর বুনো মোষ।

কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে এখন একশৃঙ্গী ভারতীয় গন্ডারের শেষ শক্ত ঘাঁটি। শিকারিদের কাছে এদের এত দাম মূলত খড়্গের জন্যে, বিদেশের বাজারে যা বিক্রি হয় চড়া মূল্যে। কাজিরাঙাকে সংরক্ষিত করবার পর থেকে ধীরে ধীরে বেড়েছে গন্ডারের সংখ্যা। বর্তমানে এই প্রাণীর সংখ্যা 1200-এর উপরে। ফলে এখন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলা যায় যে, ভারতীয় গন্ডারকে আপাতত অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো গেছে।

এ জঙ্গলের আরেক আকর্ষণ বুনো মোষ। মানসের মতোই এখানেও বুনো মোষের সংখ্যা যথেষ্ট। কাজিরাঙা ও মানসের বনভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার বুনো মোষের শেষ নিরাপদ আশ্রয়স্থল। হাতির সংখ্যা এখানে নিতান্ত কম নয়। বিকেলের জীপ ভ্রমণে হাতির দর্শন এখানে প্রায়ই পাওয়া যায়।

গন্ডার, মোষ, হাতি — এই তিন — এই তিন বৃহৎ তৃণভোজী ছাড়াও কাজিরাঙাতে আছে অজস্র পাড়া হরিণ (Hog Deer), কাকার হরিণ (Barking deer), বুনো খরগোস, শজারু প্রভৃতি। মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে এখানে আছে বাঘ, জংলী বেড়াল, শেয়াল প্রভৃতি। উল্লুক বা হুলক গিবন্ (Hoolock Gibbon) দেখা যায় কাজিরাঙার পূর্ব রেঞ্জে।

পাখির মধ্যেও নানান বিরল প্রজাতির সন্ধান মেলে এখানে। বেঙ্গল ফ্লোরিকান (Bengal Florican), চাতক (Iora), হাজারিকা (Minivet), শামুখ খোল (Openbill), হাড়গিল (Adjutant Strok), কোড়াল (Pallas's Fishing Eagle), তিলাজ বাজ (Creasted Serpent Eagle), কালো তিতির (Black Partridge), বনমুরগি (Red junglefowl) প্রভৃতি পাখির দেখা পাওয়া যায় কাজিরাঙায়। শীতকালে উড়ে আসে রাজহাঁস (Greylag Goose)। কাজিরাঙা বিখ্যাত গগনবেড়ে (Grey Pelican)-র জন্যে। গগনবেড় পাখিরা কাজিরাঙাকে বেছে নিয়েছে তাদের প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে। এখানে বাসা বাঁধে হাজার হাজার গগনবেড়।

প্রধান জাতীয় সড়কের উপর 'বাগুরি' এবং 'কোহোরা'—তে রাজ্য পর্যটন বিভাগ ও বনবিভাগের রেস্ট হাউস আছে। এছাড়া আছে 'ওয়াইল্ড গ্রাস'-এর মত সুব্যবস্থা যুক্ত রিসর্ট। কাজিরাঙার নিকটতম গ্রাম বোকাখাটের দূরত্ব ২৩ কিলো মিটার।

বর্ষাকালের স্থায়িত্ব বেশি হবার ফলে বেড়াবার মরশুমও মানসের থেকে এখানে কম। জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত এখানে আসা যায়।

ওরাং অভয়ারণ্য

ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে বিরাজ করছে ওরাং অভয়ারণ্য। ভারতের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ওরাং-এর এই জঙ্গল। প্রধানত ঘাসের এই সমতলভূমির মাঝে মাঝে চিরহরিৎ গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের গভীরে যে বাংলোটি আছে সেখান থেকেই ভারতীয় গন্ডারের দেখা পাওয়া যায়। গন্ডার ছাড়া এখানে আছে বাঘ, চিতাবাঘ, পাড়া হরিণ, বুনো মোষ, সাধারণ হনুমান প্রভৃতি।

ওরাং-এ এক বিশেষ আকর্ষণ পাখি। বাংলোর ঠিক সামনেই যে জলাটি রয়েছে, সেখানে ভেসে বেড়ায় গগনবেড়ের ঝাঁক। তাছাড়া গগনবেড় এবং মদনটাকের প্রজনন ক্ষেত্র ওরাং। মানিকজোড়, শামুখ খোল প্রভৃতি বড় পাখি ছাড়াও ছোট ছোট অনেক প্রজাতির পাখির দেখা পাওয়া যায় ওরাং-এ।

ওরাং-এ নিকটতম শহর ঢেকিয়াজুলির দূরত্ব 40 কিলো মিটার এবং তেজপুরের দূরত্ব প্রায় 85 কিলো মিটার।

থাকবার জন্য ডি. এফ. ও, তেজপুর, অসম-এর কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যায়।

সোনাই রূপাই অভয়ারণ্য

তেজপুর শহরের প্রায় 80 কিলো মিটার দূরে 175 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে বিরাজ করছে সোনাই-রূপাই অভয়ারণ্য। এই জঙ্গলের পশ্চিমে রয়েছে একটি সংরক্ষিত বনভূমি। এখানে বন্যপ্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘ, বুনো মোষ, পাড়া হরিণ প্রভৃতি। এই জঙ্গলটি প্রধানত তরাই-এর বনাঞ্চল।

নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত এখানে আসা যায়।

এখানে আসতে গেলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে —

ডি. এফ. ও. অসম (ডব্লু এল. ডিভিঃ)। পোঃ তেজপুরে, জেলাঃ সনিত্পুর, অসম-এর কাছ থেকে অনুমতি পত্র পাওয়া যায়।

এই অভয়ারণ্য বহুদিন ধরে মিলিটারির হাতে। এখানে যেতে হলে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

বারনদী অভয়ারণ্য

গুয়াহাটির 140 কিলো মিটার দূরে 26 বর্গ কিলো মিটার ঘাসের সমভূমি নিয়ে 1980 সালে ঘোষিত হয় বারনদী অভয়ারণ্য।

এ জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ লুপ্তপ্রায় 'হিস্পিড্ হেয়ার' (Hispid Hare) এবং 'পিগমি হগ্ (Pygmy Hog)। এদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই মূলত স্থাপিত হয় এই অভয়ারণ্যটি। এছাড়া এখানে আছে হাতি, বাঘ ও চিতাবাঘ।

এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় নভেম্বর থেকে মার্চ।

গুয়াহাটি থেকে সড়ক পথে বা রেলপথে টাংলা হয়েও এখানে আসা যায়।

এখানে আসতে হলে অনুমতি পাওয়া যায় নীচের ঠিকানায়।

ডি. এফ. ও. ওয়েস্ট অসম (ডব্লু, এল, ডিভি) তেজপুর, অসম।

এই অভয়ারণ্য বহুদিন ধরে সেনাবাহিনীর হাতে থাকবার জন্য এখানে আসবার জন্য সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

গারমণি অভয়ারণ্য

জোড়হাটের 70 কিলো মিটার এবং গোলাঘাটের 25 কিলো মিটার দূরে রেংমা পাহাড় থেকে নাগা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিরাজ করছে এই ছোট্ট অভয়ারণ্য। 1952 সালে গারমণি অভয়ারণ্যের জন্ম।

এখানে বাঘ, চিতাবাঘ, চিতল, পাড়া হরিণ ও হাতি আছে।

নভেম্বর থেকে মার্চ এখানে আসবার সময়।

একটিমাত্র রেস্ট হাউস আছে এখানে। থাকবার জন্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে :

ডি. এফ. ও. গোলাঘাট ডিভিশন, জোড়হাট, অসম।

নামেরি জাতীয় উদ্যান

অসম রাজ্যে উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে বিরাজ করছে আরেক অনন্য সুন্দর বনভূমি নামেরি। বর্তমানে নামেরি একটি জাতীয় উদ্যান। জাতীয় উদ্যানটিকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। 200 বর্গ কিলো মিটার আয়তন বিশিষ্ট এই জঙ্গলটি প্রধানত পর্ণমোচী অরণ্য। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া জিয়া ভোরোলি নদী এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এ জঙ্গলে প্রধান আকর্ষণ বাঘ ও হাতি। তাছাড়া এখানে পাওয়া যায় আমচিতা (Clouded Leopard), চিতাবাঘ (Leopard), ভারতীয় গাউর। সম্বর, শ্লথ ভাল্লুক, হিমালয়ের কালো ভাল্লুক, বনরুই (Pangolin), হিমালয়ের সিভেট ইত্যাদি অনেক বন্যপ্রাণী। তবে নামেরি জাতীয় উদ্যানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হল Whilewinged Wood Duck; দুষ্প্রাপ্য এই হাঁসের স্বাভাবিক আবাস্থল এই বনভূমি। তাছাড়া এখানে আছে চার প্রজাতির ধনেশ, নানান রকমের ছোট পাখি। নামেরির নিকটতম শহর ও বিমানবন্দর তেজপুরের দূরত্ব 35 কিলোমিটার আর গুয়াহাটি 181 কিলোমিটার দূরে।

নভেম্বর থেকে মার্চ মাস এখানে যাবার জন্যে শ্রেষ্ঠ সময়। মৌসুমী বায়ু এখানে তাড়াতাড়ি আসে।

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান অফিসার, ভালুকপং, সোনিতপুর জেলা, অসম। অথবা ক্যাম্প ডাইরেক্টর, ইকো-ক্যাম্প, পোতাশালি (নামেরি জাতীয় উদ্যান) সোনিতপুর জেলা অসম।

ভালুকপং-এ বাংলো ও পোতাশালিতে ক্যাম্প রয়েছে থাকবার জন্যে।

পোবিতোরা অভয়ারণ্য

গুয়াহাটি শহরের থেকে কিছু দূরে মোরিগাঁও জেলায় বিরাজ করছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভয়ারণ্য, পোবিতোরা। মাত্র 15·9 বর্গ কিলো মিটার বিশিষ্ট এই বনভূমিটির প্রধান আকর্ষণ ভারতীয় এক শৃঙ্গী গণ্ডার। গণ্ডার ছাড়া এখানে পাওয়া যায় — বুনো মোষ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভাল্লুক, ভাম ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। পোবিতোরায় রয়েছে 200 প্রজাতির পাখি। আর আছে ময়াল, গোখরো, লাউডগা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির সাপ।

পোবিতোরা থেকে গুয়াহাটির দূরত্ব মাত্র 50 কিলোমিটার। গুয়াহাটি এই অভয়ারণ্যের নিকটতম শহর, রেলস্টেশন ও বিমানবন্দর।

মৌসুমী বায়ু যেহেতু তাড়াতাড়ি আসে, সেইজন্যে মার্চ মাসের পর এখানে আসা উচিত নয়। সুতরাং নভেম্বর থেকে মার্চ এ জঙ্গলের জন্যে শ্রেষ্ঠ সময়।

থাকবার জন্য মুখ্য বনানঞ্চলক (বন্যপ্রাণী) গুয়াহাটি, অসম-কে যোগাযোগ করতে হবে।

ডিব্রু-সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান

এই জাতীয় উদ্যানটি অবস্থিতি আংশিক ডিব্রুগড় জেলায় আর বাকিটা তিনসুকিয়া জেলায়। তিনসুকিয়া শহরের উপকণ্ঠে 340 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে ডিব্রু-সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান। জাতীয় উদ্যানটির সাতটি ভাগ। এর মধ্যে মাত্র একটি বিভাগ জলাভূমি। বাকি ভাগগুলি প্রধানত ঘাসের সমতল এবং গভীর অরণ্যভূমি।

ডিব্রু-সাইখোয়ার খ্যাতি প্রায় জংলী ঘোড়া (Feral horse), ও Whitewinged Wood duck-এর জন্য। এছাড়া এখানে পাওয়া যায় চিতাবাঘ, আমচিতা (Clouded leopard), হাতি, সম্বর ও গাঙ্গেয় শুশুক (Gangetic dolphin)। প্রায় 250 প্রজাতির স্থানীয় এবং যাযাবর পাখির দেখা মেলে এই জঙ্গলে।

জঙ্গলটি নিকটতম রেল স্টেশন তিনসুকিয়ার দূরত্ব মাত্র 13 কিলো মিটার। গুয়াহাটি 483 কিলো মিটার দূরে।

এই অভয়ারণ্যের 30 কিলো মিটারের মধ্যে বোরাজান অভয়ারণ্য। এখানে হুলক গিবন বা উল্লুক ক্যাপড লাঙুর সহজেই দেখতে পাওয়া যায়।

অসমের অন্যান্য জঙ্গলের মতোই নভেম্বর থেকে মার্চ মাস এখানে আসবার প্রশস্ত সময়। তিনসুকিয়া থেকেই এই জঙ্গলে যাওয়া যেতে পারে।

থাকবার জন্য ডিব্রু-সাইখোয়র জাতীয় উদ্যান, তিনসুকিয়া, অসমকে লিখতে হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশ

নাগার্জ্জুন সাগর অভয়ারণ্য

হায়দ্রাবাদ শহরের 150 কিলো মিটার দূরে মাল্লামালাই পাহাড়কে ঘিরে বিরাজ করছে বিশাল এক অরণ্য। 1978 সালে এখানকার 3,560 বর্গ কিলো মিটার বনভূমিকে নিয়ে ঘোষিত হয় "নাগার্জুন সাগর" অভয়ারণ্য। বর্তমানে নাগার্জুন সাগর অভয়ারণ্য "বাঘ্র প্রকল্প"—এর অন্তর্গত এবং ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়।

আম্রামালাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী কৃষ্ণানদীর যে সুগভীর "গর্জ" রয়েছে তা দ্বিধা বিভক্ত করছে এই জঙ্গলকে। কৃষ্ণানদীর উপর এই জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

এই বাঁধই এখানে একমাত্র জলের উৎস। এখানে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রকম জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ও পশ্চিমের উপত্যাকায় শুষ্ক গুল্ম থেকে আরম্ভ করে শুষ্ক পর্ণমোচী গাছের জঙ্গল এবং পূর্বদিকের শুকনো বনাঞ্চলে প্রধানত বাঁশ ও কাঁটা ঝোপের জঙ্গল।

1983 সালে জঙ্গলটিকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসবার পর বনের ভিতরকার গ্রামগুলিকে বাইরে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। ফলে জঙ্গলের ভেতর মানুষ কমে যাচ্ছে এবং মানুষ কমে যাবার সাথে সাথেই গবাদি পশুর বিচরণ হ্রাস পাচ্ছে। এইসব কারণে ক্রমশ জঙ্গলটি বন্যপ্রাণীর আদর্শ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে।

"ব্যাঘ্র প্রকল্প", সুতরাং বাঘ তো থাকবেই। তাছাড়া আছে চিতাবাঘ, শ্লথ ভাল্লুক, ডোরাকাটা হায়না, নেকড়ে, কাকার হরিণ, চৌশিঙ্গা, চিতল, সম্বর, সাধারণ হনুমান, বনেট্ বানর, ভারতীয় বনরুই (Pangolin) প্রভৃতি।

শীতের আগমনে কৃষ্ণানদীর বাঁধের জলাশয়ে উড়ে আসে কিছু পরিযায়ী হাঁস। এদের মধ্যে, উল্লেখযোগ্য বড়দিঘর (Pintail), বড় রাঙামুড়ি (Redcrested Pochard) সরল (Lasser Whistling Teal) প্রভৃতি। এছাড়া এ জঙ্গলে দেখা মেলে ভীমরাজ (Rackettail Drongo), দুধরাজ (Paradise flycatcher), ময়না, দোয়েল (Magpie Robin) প্রভৃতি গায়ক পাখির। এছাড়াও আছে বিভিন্ন প্রজাতির শাখার পাখি (Tree bird)।

নাগার্জুন সাগরে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় অক্টোবর থেকে জুন। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে 45° সেঃ।

থাকবার জন্যে এই জঙ্গলে তিনটি 'গেস্ট হাউস' আছে। খাবার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়।

থাকবার জন্য "ফিল্ড ডাইরেক্টার" প্রজেক্ট টাইগার, শ্রীসেইলাম ড্যাম ইস্ট, অন্ধ্রপ্রদেশ — 512102-কে জানাতে হবে।

কোরিঙ্গা অভয়ারণ্য

অন্ধ্রে কাকিনাড়া স্টেশনের 20 কিলো মিটার দূরে 1978 সালে 236 বর্গ কিলো মিটার এলাকা জুড়ে গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপ দিয়ে গড়ে উঠেছে কোরিঙ্গা অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্য ঘাস জাতীয় গুল্ম ও লতায় ভরা। এখানে বড় গাছপালা বিশেষ নেই। গ্রীষ্মে এখানে 40° সে: পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠে।

এখানে ভোঁদড়, মেছো বিড়াল ও কুমীর ছাড়াও শীতকালে অসংখ্য জলের পাখির আগমন হয়।

কাকিনাড়া শহর থেকে এখানে আসবার জন্যে নিয়মিত বাস ও গাড়ি পাওয়া যায়। এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় নভেম্বর থেকে মার্চ।

থাকবার জন্যে কোরিঙ্গাতে একটি বনবিভাগের রেস্ট হাউস আছে।

থাকবার জন্য ডি. সি. এফ. (ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট) রাজমুন্ড্রি, অন্ধ্র-তে যোগাযোগ করতে হবে।

কোল্লেরু অভয়ারণ্য

1963 সালে বিজয়ওয়াডার 63 কিলো মিটার দূরে 347 বর্গ কিলো মিটার জলাভূমি নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল কোল্লেরু অভয়ারণ্য। কোল্লেরু লেককে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই অভয়ারণ্য। এই জলাভূমিটি অবস্থান করছে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানটিতে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর আগমনের পর এই জলাভূমির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় 600 বর্গ কিলোমিটার। পরিযায়ী হাঁস ছাড়াও এখানে দেখা যায় পানকৌড়ি (Cormorant), জলপায়রা (Indian Moorhen), ডাহুক (Whitebreasted Waterhen), জলপিপি (Bronzewinged Jacana) প্রভৃতি জলার পাখি। পার্শ্ববর্তী আরেন্দু গ্রামে গগনবেড়ে (Pelican) বাসা বাঁধে। এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি।

কোল্লেরুতে রয়েছে পাঁচটি রেস্ট হাউস।

থাকবার জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডি. সি. এফ. (ডব্লু. এল), রাজামুন্ড্রি, অন্ধ্রপ্রদেশ-তে।

নীলাপাত্তু অভয়ারণ্য

পূর্বঘাট পর্বতের পাদদেশে নদীর তীরে 590 কিলোমিটারের মিশ্র পর্ণমোচী গাছের যে জঙ্গলটি আছে 1978 সালে তা লাভ করে অভয়ারণ্যের মর্যাদা। এই জঙ্গলটির নিকটতম রেল স্টেশন রাজামুন্ড্রিয়র দূরত্ব 80 কিলোমিটার।

পাপিকোন্ডার জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, চৌশিঙ্গা ও নেকড়ের খোঁজ পাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে জুন এখানে বেড়াবার জন্য ভাল সময়।

এখানে থাকবার জন্যে দুটি বিশ্রামগৃহ আছে।

থাকবার জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডি. সি. এফ. (ডব্লু. এল.) রাজামুন্ড্রি, অন্ধ্রপ্রদেশতে।

এট্যুরনগরম অভয়ারণ্য

ওয়ারাঙ্গাল রেল স্টেশনের 190 কিলোমিটার দূরে 812 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে 1953 সালে স্থাপিত হয় এক বিশাল অভয়ারণ্য। এই বনভূমি বিস্তার লাভ করেছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্র এই তিন রাজ্যে।

শুষ্কমিশ্র পর্ণমোচী এই জঙ্গলটিতে প্রধানত আছে শাল ও সেগুন।

বন্যজন্তু ও পাখিতে সমৃদ্ধ অন্ধ্রের এই বনভূমি। মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে এখানে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভাল্লুক, শেয়াল, বনবেড়াল, চিতাবেড়াল প্রভৃতি। আর তৃণভোজীদের মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য চৌশিঙ্গা, চিঙ্কারা, মাউস ডিয়ার, কৃষ্ণসার প্রভৃতি হরিণ।

ভেতরে ঘোরাবার জন্য বনবিভাগের জিপ ও গাইড পাওয়া যায়। ভোরে ও বিকেলে বন্যজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে বন্যপ্রাণী দেখবার জন্যে মাচান বানানো হয়েছে।

থাকবারও সুবন্দোবস্ত আছে এট্যুরনগরমে। বনবিভাগের অধীনে এখানে আটটি কটেজ আছে। সেখনে ক্যান্টিনেরও ব্যবস্থা আছে।

নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত এখানে বন্যপ্রাণী দেখবার শ্রেষ্ঠ সময়।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

মিড্‌ল বাটন আইল্যান্ড জাতীয় উদ্যান

1979 সালে স্থাপিত এই জাতীয় উদ্যান ডলফিন, ডুগং ও ওয়াটার মনিটার লিজার্ড প্রভৃতি জলজ প্রাণীর জন্য বেশ সমৃদ্ধ, যদিও ভূমিজ প্রাণীদের দেখা পাওয়া ভার এখানে।

এই জাতীয় উদ্যান দেখার প্রকৃষ্ট সময় জানুয়ারি থেকে মার্চ।

এই জাতীয় উদ্যান যাওয়ার জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, মিডল আন্দামান, লং আইল্যান্ড, আন্দামান ও নিকোবর 744203 আধিকারিকের অনুমতি প্রয়োজন। এখানকার নিকটবর্তী শহর 60 কিলো মিটার দূরত্বে লং আইল্যান্ড। এখানে জাতীয় উদ্যানের মধ্যে পর্যটকদের জন্য রাত্রিবাসের এখনও কোনো পৃথক বন্দোবস্ত হয়নি। তবে সরকার অচিরেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা তৈরি করেন বলে আশা করা যায়।

মাউন্ট হ্যারিয়েট জাতীয় উদ্যান

1979 সালে 47 বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল নিয়ে এই জাতীয় উদ্যানটি গড়ে উঠেছে। আন্দামান ওয়াইল্ড পিগের প্রকৃষ্ট আবাসভূমি রূপে এই জাতীয় উদ্যান পর্যটকদের কাছে চিহ্নিত। এই প্রাণীটির অস্তিত্ব আজ সত্যিই বিপন্ন।

আন্দামান ও নিকোবর রাজধানী পোর্টব্লেয়ার থেকে মাত্র 15 কিলো মিটার দূরে এ জাতীয় উদ্যানের অবস্থিতি। ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, দক্ষিণ আন্দামান ডিভিশন

এই জাতীয় উদ্যানে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন। এখানে ভ্রমণের প্রকৃষ্ট সময় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি। চারটি বিছানা সমেত একটি সুন্দর বনবিভাগের বিশ্রাম গৃহ রয়েছে এখানে। পর্যটকরা এখানে থাকার সুযোগ নিতে পারেন।

স্যাডল পিক জাতীয় উদ্যান

1979 সালে এই জাতীয় উদ্যানটি সরকারিভাবে ঘোষিত হয়। সমুদ্রতল থেকে 738 মিটার পর্যন্ত এই জাতীয় উদ্যানের ব্যাপ্তি। স্যাডল পিক উত্তর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের একটি উঁচু চূড়া। পাখির মধ্যে আছে — আন্দামান হিল ময়না, আন্দামান ইমপিরিয়াল পিজিয়ন প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে আন্দামানের বুনোশুয়োর, নোনা জলের কুমীর ও অন্যান্য সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী।

এই জাতীয় উদ্যান দেখার অনুমতির জন্য ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, লং আইল্যান্ড, আন্দামান ও নিকোবর 744203-এর আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যটকদের জাতীয় উদ্যান দেখার প্রকৃষ্ট সময়। এই জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনবিভাগের দুটি সুন্দর বিশ্রামাগার রয়েছে। পর্যটকরা এখানে রাত্রিবাস করতে পারেন।

ব্যারেন আইল্যান্ড অভয়ারণ্য

1977 সালে ঘোষিত এই অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন প্রায় 4 বর্গ কিলোমিটার। ডলফিন ও ডুগং প্রভৃতি জলজ প্রাণীর প্রকৃষ্ট আবাসস্থল এ অভয়ারণ্যটি পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

পর্যটন ব্যবস্থা : এই অভয়ারণ্যে যেতে হলে ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, উত্তর আন্দামান ডিভিশন আধিকারিকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। জানুয়ারি থেকে মার্চ এই অভয়ারণ্য দেখার প্রকৃষ্ট সময়। এই অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর লং আইল্যান্ড সমুদ্র পথে 60 কিলো মিটার দূরত্বে অবস্থিত।

ওয়ানডুর জাতীয় উদ্যান

1983 সালে এই অভয়ারণ্যটি স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এটিকে সরকারিভাবে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জাতীয় উদ্যানে চারটি বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ আছে যা ভারতবর্ষে অনন্য। এই পাঁচটি কচ্ছপ প্রজাতি হচ্ছে — গ্রিন সি (Green Sea Turtle), লেদার ব্যাক্ড (Leatherbacked Turtle), অলিভ রিডলে (Olive Reedly Turtle) ও হক্স বিল (Hawksbill Turtle) এবং নোনা জলের কুমীরও দেখা যায় এখানে। বিভিন্ন পাখির প্রজাতিতেও এ অভয়ারণ্য সমৃদ্ধ। হোয়াইট বেলিড সি

ঈগল, আন্দামান উড পিজিয়ন, আন্দামান টীল প্রভৃতি বিচিত্র সুন্দর পাখির কলকাকলিতে এই জাতীয় উদ্যান মুখর।

বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের প্রিয় এই জাতীয় উদ্যান পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মাত্র 30 কিলোমিটার দূরে। জাতীয় উদ্যান দেখার প্রকৃষ্ট সময় জানুয়ারি থেকে মে মাস। উদ্যান দেখার অনুমতি পত্র সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ড লাইফ, পোর্ট ব্লেয়ার আধিকারিকের সঙ্গে। বনবিভাগের একটি সুন্দর বিশ্রামাগার রয়েছে জাতীয় উদ্যানের কাছেই।

নারকোনডাম আইল্যান্ড অভয়ারণ্য

1977 সালে এই অভয়ারণ্যটি সরকারিভাবে ঘোষিত হয় মূলত নারকোনডাম ধনেশ (Narcondam Hornbill) নামক একটি বিপন্ন পাখির বাসস্থান রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল এ অভয়ারণ্য দেখার প্রকৃষ্ট সময় ও এই অভয়ারণ্য দেখার অনুমতি পত্র দিয়ে থাকেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, নর্থ আন্দামান ডিভিশন। এ অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর পোর্ট ব্লেয়ার সমুদ্র পথে প্রায় 260 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

নর্থ রিফ আইল্যান্ড অভয়ারণ্য

1977 সালে উত্তর আন্দামানেব পশ্চিমে একটি ছোট দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে এই অভয়ারণ্যটি ঘোষিত হয়েছে। বিভিন্ন বিপন্ন ও বিচিত্র প্রাণীর বাসস্থান রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে এ অভয়ারণ্যটি গড়ে উঠেছে। আন্দামান টীল ও নিকোবর পিজিয়ন প্রভৃতি বিপন্ন পাখি প্রজাতির প্রকৃষ্ট আবাসস্থল এই অভয়ারণ্য। এখানে প্রবাল দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল এই অভয়ারণ্য দেখার ভাল সময়। এই অভয়ারণ্য দেখার জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার উত্তর আন্দামান ডিভিশন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। নিকটবর্তী শহর মায়াবন্দর মাত্র 30 কিলো মিটার দূরে।

সাউথ সেন্টিনেল অভয়ারণ্য

1977 সালে এটি একটি সামুদ্রিক অভয়ারণ্য হিসেবে মাত্র 1·6 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল নিয়ে ঘোষিত হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম পাড়ার স্থানকে রক্ষা করা। গ্রিন সি (Green Sea Turtle), অলিভ রিডলে (Olive Reedley Turtle), লেদার ব্যাক (Leatherbacked Turtle) প্রভৃতি বিপন্ন সামুদ্রিক কচ্ছপ এ অভয়ারণ্যে ডিম পাড়ার জন্য আসে। এখানে হোয়াইট বেলিড সি ঈগলও দেখা যায়।

অভয়ারণ্য দেখার প্রকৃষ্ট সময় জানুয়ারি থেকে মে। দেখার অনুমতির জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ড লাইফ, পোর্ট ব্লেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর পোর্ট ব্লেয়ার 125 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

উত্তরপ্রদেশ

দুধূয়া জাতীয় উদ্যান

উত্তরপ্রদেশের উত্তর লখীমপুর-খেরী জেলা এবং নেপাল সীমান্ত বরাবর বিরাজ করছে তরাই-এর এক অতুলনীয় অরণ্য। ভারতে এই শাল জঙ্গলের জুড়ি মেলা ভার।

1965 সালে এই বনভূমিকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় এবং 1977 সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী সংরক্ষক বিলি অর্জুন সিং-এর প্রচেষ্টাতে অভয়ারণ্যটিকে জাতীয় উদ্যান-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই জাতীয় উদ্যানের আয়তন 490 বর্গ কিলোমিটার। দুধূয়াকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করবার সময় বিভিন্ন মহল থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বনবিভাগ চেয়েছিল জঙ্গলটিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করতে। এই উদ্যানটির দক্ষিণে যে পালিয়া গ্রামটি আছে, তার অধিবাসীদের আপত্তি ছিল যে এই জঙ্গলটিকে জাতীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্য ঘোষণা করলে তাদের জ্বালানি পাবার ও ঘর তৈরির সরঞ্জাম পেতে অসুবিধে হবে। শিকারিরাও এখানে শিকার বন্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। এই সব বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের বাধা পেরিয়েও দুধূয়াকে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করা সম্ভব হয়। বর্তমানে জঙ্গলটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন। দুধূয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে, প্রায় জাতীয় উদ্যানের সীমানা বরাবর বয়ে চলেছে "সুহেলী" নদী। সুহেলীর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এসে মিশেছে "নিওরা" নালা।

উত্তর সীমানা বরাবর পূর্বে নেমে গেছে "জাভারাহা" নালা। আগেই বলা হয়েছে যে, এই বনভূমিটি গড়ে উঠেছে প্রধানত শ্রেষ্ঠ জাতের শাল গাছ দিয়ে। এছাড়া মাঝে মধ্যে ইউক্যালিপটাসের চাষ করা হয়েছে। জঙ্গলে হরতকি, বয়ড়া, মহুয়ারও কিছু কিছু গাছ দেখা যায়।

জঙ্গলের বুক চিয়ে চলেছে গৌরীফান্টা থেকে বেরিলির মিটার গেজ ট্রেন লাইন, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক বরাবর, আর পালিয়া চন্দনচৌকীর ট্রেন লাইন চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তর বরাবর।

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে নেমে দুধূয়ার জন্যে ভোর ছ'টার বাস যদি ধরা না যায় তাহলে লাখীমপুরের বাস ধরতে হবে; লাখীমপুর থেকে দুধূয়ার বাস পাওয়া যায়। এই লাখীমপুরেই "ডাইরেক্টার"-এর দপ্তর। দিল্লি থেকে অবশ্য মরসুমে সরাসরি বাস পাওয়া যায়। এছাড়া লক্ষ্ণৌ থেকে "মৈলানী" হয়ে রেলপথে দুধূয়া পৌঁছানো যায়।

বাঘের জন্যে বিখ্যাত হলেও দুধূয়াতে দেখা মেলে অজস্র বন্যপ্রাণীর। এই জঙ্গলের বিলি অর্জুন সিং পোষ মানিয়েছিলেন 'তারা' নামে এক ব্যাঘ্র শিশুকে। প্রায় কুড়ি মাস ধরে তারাকে বড় করবার পর ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে বাঘের সংখ্যা 50-এর উপরে।

বাঘের তুলনায় চিতাবাঘের সংখ্যা এখানে কম, যদিও চিতাবাঘ যে এখানে দেখা যায় না, তা নয়।

হাতির পিঠে চলতে চলতে দেখা পাওয়া যাবে ভাল্লুকের গুহার। গুহা বা তার আশেপাশে শ্লথ ভাল্লুকের দেখাও পাওয়া যেতে পারে।

প্রায় তিরিশটি হাতির একটি পাল দুধূয়া এবং নেপালের বলদিয়া অভয়ারণ্যের মধ্যে যাতায়াত করে।

দুধূয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বারশিঙ্গা হরিণ (Softground Barasinga)। কান্হার বারশিঙ্গার থেকে এরা বেশ আলাদা। কান্হার হরিণগুলির তুলনায় এরা কিছুটা ছোট এবং গায়ের রঙ অনেক উজ্জ্বল। দক্ষিণ পশ্চিমে "সাতিয়ানা" এবং দক্ষিণ পূর্বে "কাকরাহা" ব্লকে সাধারণত এই বারশিঙ্গার দেখা পাওয়া যাবে। এখানে প্রায় 2000 বারশিঙ্গা আছে। এছাড়া এখানে দেখা যায়, মেছো ও জঙ্গলি চিতবেড়াল, খ্যাঁকশেয়াল, পাতি শেয়াল প্রভৃতি। আর তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে আছে অসংখ্য চিতল হরিণ, সম্বর, বনশুয়োর, সিভেট্, কাকার হরিণ, পাড়া হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি।

সুহেলী নদীর জঙ্গলে অসংখ্য চিতল মাছ; আর সেই মাছের জন্যে ভীড় জমায় ভোঁদড়ের দল; এখানে ভোঁদড় ছাড়াও আছে মগ্গর কুমীর আর কচ্ছপ। সরীসৃপের মধ্যে দেখা পাওয়া যায় ময়াল সাপ ও গোসাপের নেওরা ও সুহেলীর পাড়ে।

পাখির রাজ্য দুধূয়া।

স্টর্ক থেকে শুরু করে ছোট গাছের পাখি এবং শিকারি পাখি, পরিযায়ী হাঁস— প্রায় দু'শ প্রজাতির সন্ধান মেলে তরাই-এর অরণ্যে। 'ক্রেন জাতীয় পাখির মধ্যে এখানে আছে সারস। স্টর্ক জাতীয় পাখির মধ্যে রয়েছে লোহাজাং, মানিকজোড়, মদনটাক প্রভৃতি। শিকারি পাখির মধ্যে কোড়াল (Palls's Fishing Eagle), গিন্নী শকুন (Scavenger Vulture), শিক্‌রা, তিলাজবাজ (Crested Sperpant Eagle), করোটিয়া (Kestrel), তরুম্‌তি (Redheaded Marlin) প্রভৃতি। ছোট পাখিদের মধ্যে হাজারিকা ওয়াবলার (Warbler), রামগ্যাংরা (Grey Tit), দামা (Orangebellied Ground Thrush), নানা জাতের সান বার্ড প্রভৃতির সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। এছাড়া লাল বনমুরগী, ছাই রঙা তিতির, বটের, কাঠঠোক্‌রা, টিয়া, ময়ূর, বিভিন্ন জাতের বুলবুলি ও নানা রকম Chat ভরে আছে দুধূয়ার জঙ্গলে।

জঙ্গলে ঘোরবার জন্য বনদপ্তরের হাতি পাওয়া যায়— সকালে ও বিকেলে। জিপে বেড়াবারও ব্যবস্থা আছে এখানে। বাঁকেতে তাদের ওয়াচ টাওয়ার থেকে সুহেলী নদীর পাড়ে ভোঁদড়, কচ্ছপ ও পাইথনের দেখা মিলবে। আর টাইগার তাল-এ যে ওয়াচ টাওযারটি আছে শীতকালে সেখানে সামনের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে শীতে দেখতে পাওয়া যায় অজস্র প্রজাতির পরিযায়ী পাখির ও বারশিঙ্গা হরিণের।

দুধুয়া, সাতিয়ানা, সোনারিপুর, বনকাটি প্রভৃতি স্থানে বাংলো আছে এবং প্রায় সবকটি স্থানেই ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে।

এখানে বন্য জন্তু দেখার শ্রেষ্ঠ সময় মার্চ থেকে মে, তবে পাখির জন্যে এখানে আসতে হবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। অনুমতির জন্যে লিখতে হবে— ফিল্ড ডাইরেক্টার, দুধুয়া টাইগার রিজার্ভ, লাখীমপুর-খেরী, উঃ প্রঃ।

উত্তরাঞ্চল

করবেট জাতীয় উদ্যান

প্রখ্যাত জীবসংরক্ষক জিম করবেটের নামানুসারে 1935 সালে জন্ম হয়েছিল করবেট জাতীয় উদ্যানের। অবশ্য তখন তার নাম ছিল হেইলি জাতীয় উদ্যান। 1957 সালে এই ন্যাশনাল পার্কটির নাম পরিবর্তন করা হয় করবেট জাতীয় উদ্যান। কিছুকালের জন্যে এর নাম হয়েছিল রামগঙ্গা জাতীয় উদ্যান। এই জঙ্গলটি ভারতবর্ষের আদি ও প্রথম জাতীয় উদ্যান। নৈনিতাল ও গাড়োয়াল জেলার 400 থেকে 1100 মিটার উচ্চতায় 520.8 বর্গ কি. মি. বনভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই জাতীয় উদ্যান। করবেট

ধিকালার বিস্তীর্ণ ঘাসের সমতলে বুনো হাতির পাল।

পার্কের সীমানার মধ্যে রয়েছে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশ এবং পট্‌লীদুল উপত্যকা। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ রামগঙ্গা। এই উদ্যানটি বর্তমানে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত।

লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগোদাম হয়ে যেতে হবে কাঠগুদাম। এখান থেকে বাসে রামনগর যাওয়া যায়। রামনগরেই ব্যাঘ্রপ্রকল্পের দপ্তর। যাবতীয় অনুমতি পত্র নিয়ে বন দপ্তরের বাসে, জিপে অথবা বেসরকারি বাসে করবেট পার্কে পৌঁছে যাওয়া যায়। করবেট পার্কের সঙ্গে বাস যোগাযোগ রয়েছে 112 কি. মি. দূরের রানিখেত, 118 কি. মি. দূরের নৈনীতাল ও 297 কি. মি. দূরের দিল্লির। রামনগর থেকে করবেটের দূরত্ব 57 কি. মি.।

এই জঙ্গলটি মিশ্র শালের জঙ্গল। শাল, মহুয়া, বয়রা, হরিতকি প্রভৃতি গাছের ঘন বনে ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায় উঁচু উঁচু 'এলিফ্যান্ট গ্রাসের' মাঠ। এই বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ঢালু হয়ে মিশে গেছে রামগঙ্গা নদীতে। কোথাও রাস্তা চলে গেছে উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, গভীর খাদকে পাশে রেখে। বয়ে চলে রামগঙ্গা। তার স্বচ্ছ জলের নীচে দেখা যায় গোল, গোল নুড়ি পাথর ও মাছ খেলে বেড়ানোব দৃশ্য। শীতকালে জঙ্গল থেকে নৈনীতালের বরফের চূড়া দেখা যায়।

করবেট নামের সঙ্গে বাঘ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক সময় এখানে বাঘের সংখ্যা ছিল অনেক। এখন এর সরকারি সংখ্যা দাঁড়িয়ে একশোর কিছু বেশি। চিতাবাঘ, ডোরাকাটা হায়না, নেকড়ে, বুনো শুয়োর, নীলগাই, গোরাল, কাকার হরিণ, সম্বর, শেয়াল, বেজী, শজারু প্রভৃতির সংখ্যাও যথেষ্ট। ঘাসের সমতলভূমিতে একসঙ্গে 250-300 চিতল হরিণ চরতে দেখা যায়। করবেটের আরেক আকর্ষণ বন্য হাতি। করবেট পার্কে হাতির সংখ্যা প্রায় 400। আর আছে অজস্র প্রজাতির চিত্তাকর্ষক পাখি। পাখির মধ্যে এখানে দেখা পাওয়া যায় কালী শ্যামা, হোয়াইট থ্রোট (White Throat), লাফিং থ্রাশ (Laughing Thrush), কুকাল (Crow Pheasant), ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue bird), দুধরাজ, হুপো, কাঠঠোকরা, গয়ার (Darter), লোহাজাং, সারস, মানিকজোড় (Whitenecked Stork), ময়ূর, বনমোরগ, কালো তিতির, বটের (Quail), ছাতারে পাখি (Babbler) প্রভৃতি।

রামগঙ্গা নদীর স্বচ্ছ জলে দেখতে পাওয়া যাবে মহাশোল মাছের ঝাঁক। নদীর পাড়ে শীতকালে রোদ পোহায় কুমীর। সারাদিন মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকে ভোঁদড়ের দল। রামগঙ্গা নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ আছে। নদীর পাড়ে দেখতে পাওয়া যায় "ইন্ডিয়ান রক্ পাইথনের" গর্ত। এখানে সন্ধান মেলে মোট 50 জাতের স্তন্যপায়ী জীব, 580 প্রজাতির পাখি ও 25 রকম সরীসৃপের।

জঙ্গলে ঢোকবার জন্যে জিপ ও হাতি—দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। ভোরে এবং বিকেলে, এই দু'সময়েই জঙ্গলে ঢোকা যায়।

শীতে এখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে নেমে আসে। গ্রীষ্ম তেমন প্রখর নয়। বন্যজন্তু দেখার শ্রেষ্ঠ সময় মার্চের গোড়া থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত। পার্ক বন্ধ হয়ে যায় জুলাইয়ে, খোলে নভেম্বরে।

করবেট পার্কে থাকবার অনেকরম ভাল বন্দোবস্ত আছে। মূল প্রবেশ দ্বার ধানগাড়ি গেট থেকে যেতে হবে ধিকালা। ধিকালাতেই গড়ে উঠেছে পর্যটক আবাস। অনুমতি পাওয়া যায়— ফিল্ড ডিরেক্টার, করবেট টাইগার রিজার্ভ, রামনগর, জেলা: নৈনীতাল, উ: প্র:।

চিল্লা অভয়ারণ্য

চিল্লা অভয়ারণ্য স্থাপিত হয়েছিল 1977 সালে গঙ্গার পূর্বতীর বরাবর 249 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে। এই অভয়ারণ্যে দেখতে পাওয়া যায় বনবেড়াল ও শ্লথ ভাল্লুক। হাতির পালও দেখা যায় এখানে। হরিদ্বার থেকে 7 কিলো মিটার দূরের এই জঙ্গলে কোটালওয়াড়ার ওয়াইল্ডলাইফ্ ওয়ার্ডেন-এর অধীনে বন-বিভাগের একটি বাংলো আছে।

গোবিন্দ অভয়ারণ্য

মুসৌরি থেকে 100 কিলো মিটার দূরে টন উপত্যকার উপরের দিকে 953 বর্গ কিলো মিটার অরণ্য নিয়ে গোবিন্দ অভয়ারণ্যের জন্ম হয়েছিল 1955 সালে। হর্-কি-দুনের কিছুটা অংশ এই অভয়ারণ্যের অন্তর্গত। এখানে হিমালয়ের বাদামি ভাল্লুক ও কস্তুরী হরিণ পাওয়া যায়। তাছাড়া আছে চিতাবাঘ।

মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়।

এখানে একটি বনবিভাগের বাংলো আছে।

নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান

ব্রিটিশ পর্বতারোহী এরিক শিপ্‌টন ও বিল টিল্‌ম্যান 1936 সালে নন্দাদেবী অভিযানের সময় সর্বপ্রথম এই প্রাকৃতিক অভয়ারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। 1980 সাল থেকে এই অভয়ারণ্যে একমাত্র পর্বতারোহীদেরই অনুমতি দেওয়া হয়। 630 বর্গ কিলোমিটার এই অভয়ারণ্যটি স্থাপিত হয় 1980 সালে। এই অভয়ারণ্যে তুষার চিতাবাঘ ছাড়াও গোরাল ও কস্তুরী মৃগ আছে। আর আছে ব্লু-ম্যাগ্‌পাই ও ফেয়ারি-ব্লু-বার্ডের মতো সুন্দর সুন্দর পাখি।

দেরাদুনের 295 কিলো মিটার দূরের এই অভয়ারণ্যে থাকবার কোনও বন্দোবস্ত নেই।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ভারতীয় পর্বতারোহী ফেডারেশনের অনুমতি নিয়ে এখানে ওঠা যায়।

কেদারনাথ অভয়ারণ্য

গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে এই 967 বর্গ কিলো মিটার উঁচু এই অভয়ারণ্যটি বিখ্যাত কস্তুরী মৃগের জন্যে। দেরাদুনের 228 কিলো মিটার দূরের এই অভয়ারণ্যটির 1972 সালে জন্ম।

এখানে চিতাবাঘ, থর্ ও সেরুর খোঁজ মেলে। পাখির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলুপ্তপ্রায় "মোনাল ফেজেন্ট"। এছাড়া আছে কালিজ।

এখানে বেশ কয়েকটি বাংলো আছে।

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার জাতীয় উদ্যান

নামের থেকে অনুমান করা যায় যে হিমালয়ের বুকে এই ছোট্ট জাতীয় উদ্যানটি বিখ্যাত বুনো ফুলের জন্যে। 1981 সালে 87 বর্গ কিলো মিটার জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল ফুলের এই নন্দনকানন!

ফুল ছাড়া এখানে খেলে বেড়ায় রং-বেরঙের প্রজাপতি। হিমালয়ের অনেক প্রজাতির পাখিও এখানে দেখা যাবে।

নিকটতম জনবসতি যোশী মঠ থেকে 33 কিলো মিটার হাঁটতে হবে এখানে পৌঁছতে।

ফুলের শোভা দেখবার শ্রেষ্ঠ সময় জুলাই ও অগস্ট।

দুটি রেস্ট হাউস আছে এখানে।

রাজাজী অভয়ারণ্য

দেরাদুনের পাহাড়ি উপত্যকায় 1966 সালে 246 বর্গ কিলো মিটার জঙ্গল নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল রাজাজী অভয়ারণ্য।

এখানে প্রধানত দেখা যায় চিতল হরিণ ও সম্বর, যদিও বাঘ ও চিতাবাঘেরও খবর আছে।

নিকটতম শহর ও রেলস্টেশন হরিদ্বারের দূরত্ব 12 কিলো মিটার। দেরাদুনের "ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন"-এর অধীনে এখানে কয়েকটি রেস্ট হাউস আছে।

ওড়িশা

সিম্‌লিপাল জাতীয় উদ্যান

ওড়িশার উত্তরভাগে ময়ূরভঞ্জ জেলায় সিম্‌লি পাহাড়কে ঘিরে বিরাজ করছে অনিন্দ্যসুন্দর এক বনভূমি। শালের এত প্রাচুর্য ভারতে বোধ হয় আর কোথাও নেই। 2750 বর্গ কিলো মিটারের এই জঙ্গলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় 1957 সালে। আর 1980-তে এই অভয়ারণ্যের মাত্র 117 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে জন্ম নেয় সিম্‌লিপাল জাতীয় উদ্যান। সিম্‌লিপাল এখন 'ব্যাঘ্র প্রকল্পের' আওতায়।

কলকাতা আর কেওনঝড়ের মধ্যে যে বাসগুলি যাতায়াত করে সেগুলি ছুঁয়ে যায় যশীপুর, ভুবনেশ্বর থেকে যার দূরত্ব 256 কিলো মিটার। আর কলকাতা থেকে সাড়ে ছ'ঘন্টার রাস্তা, অর্থাৎ প্রায় 300 কিলো মিটার। এই যোশীপুরেই রয়েছে জঙ্গলের প্রবেশ দ্বার। যোশীপুর থেকে গুরগুরিয়া গেট পার হয়ে 40 কিলো মিটার দূরে জোরাণ্ডা, 125 কিলোমিটার দূরে আপার বরাকমরা, 100 কিলো মিটার দূরে জেনাবিল ও 65 কিলো মিটার দূরে নাওয়ানা। এই সবকটি জায়গাতেই বনবিভাবের পর্যটন আবাস আছে। বারিপদা দিয়ে 'লুলুং' গেট পেরিয়েও আপার বরাকমরা পৌঁছানো যায়। তবে এখন উত্তর সিমলিপলি পর্যটকদের জন্যে বন্ধ।

ছোট বড় 12 টি নদী বয়ে চলেছে সিম্‌লিপালের বুকে। এসব নদী সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ঝরনা আর জলপ্রপাত। জোরণ্ডার জলপ্রপাত পড়ছে 700 ফুট উঁচু থেকে। সেই জলপ্রপাত থেকে জন্ম নিয়েছে খরস্রোতা নদী আর সেই নদী সৃষ্টি এক গভীর গিরিখাত। জোরাণ্ডার বাংলোর সামনে দাঁড়ালে সামনে চোখে পড়ে গিরিখাত, স্ফীত জলপ্রপাত আর তাকে ঘিরে আছে এক গভীর সবুজ বনভূমি। বর্ষায় আর শরতে মেঘ আনাগোনা করে জোরাণ্ডার ওই গভীর খাতে। সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

'বরাইপানি' শব্দের অর্থ স্থানীয় ভাষায় 'দড়ির মতো জল'! সত্যিই বরাইপানি জলপ্রপাত ঝরে পড়ছে অনেক ভাগে ভাগ হয়ে দড়ির মত ধারায়।

সিম্‌লি পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে জঙ্গল উঠে গেছে সাড়ে সাতশো থেকে প্রায় হাজার ফিট উচ্চতায়। সিম্‌লিপালের জঙ্গলের চরিত্র প্রায়-চিরহরিৎ। সবুজের ছড়াছড়ি। শালের এত সুন্দর জঙ্গল বিরল। শাল ছাড়া এ জঙ্গলে আছে অর্জুন, অশোক, কৃষ্ণচূড়া, শিমূল, পলাশ, আমলকী, হরিতকি, মহুয়া, কদম, কাঞ্চন প্রভৃতি গাছ। চাহালার 'ইউকালিপটাস ভিলা'কে ঘিরে রয়েছে উঁচু উঁচু ইউক্যালিপটাসের এক মনোরম বন। বর্ষায় এখানে ফোটে অজস্র রকমের বুনোফুল আর রঙ বেরঙের অর্কিড, বিভিন্ন জাতের বুনো ছত্রাক। জন্মায় ছোট ছোট মিষ্টি বুনো জাম। "ব্যাঘ্র প্রকল্প" সুতরাং বাঘতো থাকবেই। 40 টির মতো বাঘের সন্ধান মেলে সিম্‌লিপালে। বিশাল জঙ্গল, তাই বাঘ দেখবার ঘটনা বিরল। বাঘ ছাড়া এখানে আছে চিতাবাঘ, চিতাবেড়াল, বনবেড়াল, শ্লথ ভাল্লুক, শেয়াল

প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী। সিম্‌লিপালের প্রধান আকর্ষণ হাতি। প্রায় আড়াই হাজার হাতি আছে এ জঙ্গলে। একটু বেশি রাতে চাহালার রাস্তায় জিপে করে নিঃশব্দে অপেক্ষা করলে হাতির দেখা পাওয়া মোটামুটি নিশ্চিত। চাহালা ও জেনাবিলের বাংলোর আশেপাশে প্রায় নিয়মিতই হাতির আনাগোনা আছে। তৃণভোজীদের মধ্যে আর আছে গাউর, সম্বর, চিতল হরিণ, খরগোস, শজারু, বনরুই, গন্ধগোকুল প্রভৃতি।

সিম্‌লিপাল পাখির স্বর্গ। বর্ষায় সমস্ত বনভূমি মেতে ওঠে পাহাড়ি ময়নার সুরেলা গানে। বিশেষত চাহালা ও জোরাণ্ডায় ওদের দেখা পাওয়া যায় ঝাঁকে, ঝাঁকে; শীতে এখানে নজর কাড়ে সাদা-কালো ভারতীয় ধনেশ। সারা বছর জঙ্গল মাতিয়ে রাখে রোজফিঞ্চ (Rose Finch), ভীমরাজ (Racketail Drongo), ময়ূর, পাশফুটকী (Leaf Warbler), হাজারিকা, লাল বনমুরগি ছাই রঙা তিতির, বটের প্রভৃতির পাখি। তাছাড়া শিক্‌রা (Sikra), তুরুম্‌ (Merlin), নানা ধরনের ঈগল, বাজ, প্যাঁচা প্রভৃতি অসংখ্য রকমের শিকারি পাখিরও দেখা পাওয়া যায় এখানে।

কীট্‌পতঙ্গ-প্রেমীদের জন্যে সিম্‌লিপাল স্বর্গরাজ্য। নানা ধরনের প্রেইং মেন্টিস্‌ (Preying Mantis), মাকড়সা, বিটল, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতির সন্ধান মেলে এই জঙ্গলে।

যোশীপুরে রামতীর্থে রয়েছে একটি 'কুমীর প্রকল্প'। সিম্‌লিপালের প্রাক্তন বনপাল স্বর্গত সরোজ রায়চৌধুরী খৈরী নদীর কাছে পেয়েছিলেন একটি বাঘের বাচ্চাকে। নাম দিলেন খৈরী। যশীপুরের বনবিভাগের দপ্তরের সামনে খোলা জায়গায় ছাড়া অবস্থায় ঘুরে বেড়াত খৈরী, সরোজবাবুর জিপে চড়ে, বন-জঙ্গল ঘুরে বেড়াত ওই বাঘিনী। আজও খৈরীর কথা যোশীপুরে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

সিম্‌লিপালে ঢোকবার জন্য যদি নিজস্ব জিপ না থাকে, তাহলে যোশীপুর বাজার থেকে ভাড়া করে নেওয়া যায়। জঙ্গলের ভিতরের রেস্ট হাউস গুলিতে জায়গা না পাওয়া গেলে যোশীপুরে ক্রোকোডাইল প্রজেক্ট-এর অধীনে বাংলো পাওয়া যায়। সে বাংলোও যদি অমিল হয় ডাঃ রায়ের ট্যুরিস্ট লজেও কম খরচে থাকা যেতে পারে।

সিম্‌লিপালে যে কোনও সময়ই যাওয়া যেতে পারে ; এক এক ঋতুতে এর এক এক রূপ। তবে ইদানীং 15 জুলাই থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

জঙ্গলে চাহালা, নওয়ানা, জোরান্ডা, বরাইপনি প্রভৃতি বাংলোর থাকবার জন্যে লিখতে হবে — ফিল্ড ডিরেক্টর, সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প। বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, ওড়িষ্যা।

চিল্কা অভয়ারণ্য

ভুবনেশ্বরের 100 কিলো মিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁষে বিরাজ করছে চিল্কা হ্রদ। সামান্য এক চিল্‌তে বালির দেওয়াল চিল্কাকে আলাদা করে রেখেছে বঙ্গোপসাগর থেকে।

চিল্কার নজর মিনারের সামনেই পরিযায়ী পাখির ভিড়।

1973 সালে 700 বর্গ কিলোমিটার এই নোনা জলের হ্রদটিকে অভয়ারণ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

কলকাতা থেকে সরাসরি রেলপথে চিল্কা আসা যায়। গোপালপুর, পুরী ও ভুবনেশ্বর থেকেও চিল্কার বাস যোগাযোগ আছে।

শীতের শুরুতেই এই হ্রদে আসতে আরম্ভ করে পরিষায়ী হাঁসেরা। তখন পাখির ভীড়ে জল দেখতে পাওয়া যায় না। এই হাঁসেদের মধ্যে প্রধান রাঙামুড়ি (Pochard)। এছাড়া খুন্তেহাঁস (Shovelar), নীলগির (Mallard) প্রভৃতি। হ্রদের জলে জেগে থাকা ঘাস আর লতাপাতা ভরা জলভূমিতে ভীড় জমায় সাদা কাক (Grey Heron), গগনবেড় (Pelican), গয়ার (Dartar), পানকৌড়ি (Cormorant), টার্ন, গাল প্রভৃতি হাজার হাজার পাখি। পরিযায়ী হাঁসেরা থাকে মার্চ মাস পর্যন্ত। কিছুটা এগিয়ে গেলে সাতপাড়ায় দেখা যাবে শুশুক বা Gangetic Dolphin হ্রদে ঘোরবার জন্যে রম্ভা থেকে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।

ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত চিল্কায় যাওয়া যায়।

চিল্কার তীরবর্তী বার্‌কুলে ট্যুরিস্ট লজ আছে।

থাকার জন্য যোগাযোগ করতে হবে — ম্যানেজার, পান্থনিবাস, বারকুল, ওড়িশাতে।

ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য

ভদ্রকের 45 কিলো মিটার দূরে চাঁদবালি। আর চাঁদবালি থেকে 35 কিলো মিটার দূরে ভিতরকণিকা। ব্রাহ্মণী নদীকে ঘিরে 650 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে 1975 সালে

ঘোষিত হয় এই অভয়ারণ্য। পূর্ব ভারতে সুন্দরবন ছাড়া এত ভাল ম্যাংগ্রোভ জঙ্গল আর কোথাও নেই।

যে কোনো পুরীগামী ট্রেনে ভদ্রক নেমে চাঁদবালির বাস ধরে চাঁদবালি। এখান থেকে নৌকোয় যেতে হবে ভিতরকণিকা। বালেশ্বর থেকেও বাস যোগাযোগ আছে চাঁদবালির।

কুমীর ও সামুদ্রিক কচ্ছপ (Olive Ridley) এখানকার বিশেষ আকর্ষণ। আর আছে অসংখ্য পাখি বিশেষত শীতকালে এদের ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়।

অক্টোবর থেকে মে পর্যন্ত ভিতরকণিকায় যাওয়া যায়। বর্ষাকালে এ নদী পার না হওয়াই ভাল!

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এখানে ডিম পাড়তে আসে লক্ষাধিক রিড্‌লে কচ্ছপ। ডিম পেড়ে বালি ঢাকা দিয়ে ওরা আবার সমুদ্রে চলে যায়। বাচ্চা ফুটলে নিজেরাই সমুদ্রে নেমে যায়।

জুলাই-অগস্ট মাসে এখানে বাসা বাঁধে অসংখ্য শামুকখোল, সোনাজঙ্ঘা, সাদা কাক আর গয়ারের ঝাঁক। এছাড়া ছয় রকমের মাছরাঙা আর অসংখ্য ছোট পাখির এখানে দেখা পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে এখানে আছে প্রচুর চিতল হরিণ, বনশুয়োর, বাঁনর, চিতল, বনবেড়াল, দু'রকমের গোসাপ, কুমীর প্রভৃতি।

তিনটি রেস্ট হাউস আছে এখানে।

ডি. এফ. ও., চাঁদবালি, বালেশ্বর, ওড়িশা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

বাইশিপল্লি অভয়ারণ্য

পূর্বঘাট পর্বতের কোলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 855 মিটার উঁচুতে 166 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে 1981 সালে স্থাপিত হয় বাইশিপল্লি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।

নিকটতম রেলস্টেশন খুরদা রোডের দূরত্ব 80 কিলো মিটার। খুরদা রোডে নেমে বাসে করে এখানে আস যায়।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এখানে যাবার পক্ষে উপযুক্ত সময়।

চারটি রেস্ট হাউস আছে এখানে।

থাকাবার জন্য যোগাযোগ করতে হবে ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ারডেন, বাইশিপল্লি অভয়ারণ্য, নয়াগড় ফরেস্ট ডিভি:, জেলা : পুরী, ওড়িষ্যা-তে!

বালুখণ্ড অভয়ারণ্য

পুরীর 10 কিলো মিটার দূরে সমুদ্রতটে, প্রধানত রীড্‌লে কচ্ছপকে বাঁচাবার তাগিদে 1984 সালে স্থাপিত হয় এই অভয়ারণ্যটি। এই অঞ্চলটি ওই কচ্ছপের প্রজনন ক্ষেত্র। এখানে কিছু কৃষ্ণসার হরিণও আছে। জলে গাল ও টার্ন জাতীয় পাখি আসে।

অক্টোবর থেকে মে পর্যন্ত এখানে আসা যায়।

থাকবার জন্যে 14 টি রেস্ট হাউস আছে এখানে।

থাকবার জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডি. এফ. ও., পুরী ফরেস্ট ডি ভি:, পো: খুর্‌দা, ডি: পুরী, ওড়িষ্যা-তে।

উষাকোঠী অভয়ারণ্য

1962 সালে স্থাপিত এই অভয়ারণ্যটি প্রায় 285 স্কোয়ার কিলো মিটার অঞ্চল জুড়ে উড়িষ্যায় উত্তর-পূর্ব ভাগে সম্বলপুর থেকে 22 কিলো মিটার দূরে অবস্থান করছে। এর পশ্চিমে আছে হীরাকুঁদ বাঁধের জলাধার। সমস্ত অঞ্চলটি এই জালাধারের জলে পুষ্ট। এই অভয়ারণ্যটি ঘুরে দেখবার সবচেয়ে সুন্দর সময় হল, অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত।

এই মিশ্র পর্ণমোচী বনে যে সব গাছ দেখতে পাওয়া যায় তা হল ঝাউ, শাল, চন্দন, অর্জুন, লোহাকাঠ, নিম, বাবলা ইত্যাদি।

বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায় তা হল, হাতি, সম্বর, চিতা এবং গাউর।

বর্তমানে এখানে বাঘের সংখ্যা প্রায় 10 টি এবং ব্যাঘ্রশাবক 2টি। হাতি আছে প্রায় 300 টি। জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ হিসাবে আছে ভীমরাজ (Rackettail Drongo), কেশরাজ (Haircrested Drongo)।

এখানে দ্বি-শয্যা বিশিষ্ট দুটি কামরার একটি রেস্ট হাউস আছে। সেখানে থাকার জন্য, ডি.এফ.ও বামরা সম্বলপুর, উড়িষ্যার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয়।

কর্ণাটক

বান্দীপুর জাতীয় উদ্যান

মহীশূর থেকে উটকমান্ড যাবার পথে মহীশূর শহর থেকে 80 কিলো মিটার দূরে বিরাজ করছে 690 বর্গ কিলো মিটার আয়তন নিয়ে "বান্দীপুর জাতীয় উদ্যান"। এই জাতীয় উদ্যানের জন্ম 1930 সালে, অভয়ারণ্য হিসাবে। তখন এর আয়তন ছিল মাত্র বর্গ 60 কিলো মিটার। তারপর 1973 সালে অভয়ারণ্য হিসাবে 630 বর্গ কিলোমিটার বাড়ানো হয়। এই জাতীয় উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে যথাক্রমে নাগারহোল, ওয়াইনাদ, মুডুমালাই-এর জঙ্গল। উত্তর পূর্বে এই জঙ্গলকে আরো বাড়াবার পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে বান্দীপুর ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত। কলকাতা থেকে ট্রেনে মহীশূর পৌঁছে, মহীশূর উটীগামী বাসে উঠলে বান্দীপুরে পৌঁছনো যাবে।

উঁচু উঁচু গাছ, বাঁশঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাসের এই জঙ্গলে মন কেড়ে নেয় ময়না আর ফিঙের সুরেলা সঙ্গীত। এই অরণ্যের মধ্যে আছে দীর্ঘ 'গর্জ', আর পশ্চিমঘাটের এক

নৈস্বর্গীক শোভা। পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে এখানে সর্বোচ্চ গোপালস্বামী বেত্ত শৃঙ্গ (1,454 মি.)। কাবেরীর শাখানদী 'কাবিনি' বয়ে চলেছে এই জঙ্গলের বুক চিরে।

বান্দীপুর প্রধানত শুষ্ক পর্ণমোচী গাছের বন। অন্যান্য পর্ণমোচী জঙ্গল থেকে বান্দীপুরের পার্থক্য হলো, অন্যান্য জঙ্গলে শীতকালে গাছের পাতা ঝড়ে পড়ে কিন্তু এখানে পাতা ঝরে গ্রীষ্মে। বান্দীপুরে দু'জাতের দামি কাঠ পাওয়া যায় — রোজ উড এবং সেগুন। এছাড়া এই বনভূমিতে রয়েছে মাথি ও নান্দি জাতীয় প্রায় 100 ফিট উঁচু উঁচু গাছ। বান্দীপুরের জঙ্গলে প্রচুর কচু ও লাউ জাতীয় সবজি জন্মায়, যা আকর্ষণ করে নানান ধরনের পশুকে। নীচের দিকে ল্যান্টানা জাতীয় লতা ও নানান রকম গুল্মের ঘন ঝোপ দেখা যায়। এখানে জঙ্গলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে পলাশ আর শিমূল। তাছাড়া আছে বিস্তীর্ণ ঘাসের সমতল জমি ও বাঁশঝাড়।

বান্দীপুর বিখ্যাত এখানকার হাতির জন্যে। এত বেশি সংখ্যায় হাতি আর কোথাও নেই। এক হাজারেরও বেশি হাতি আছে এখানে। বর্ষার সময় যখন সব জায়গায় জলে ভরে থাকে, হাতির পাল তখন সমস্ত জঙ্গলজুড়ে বিচরণ করে এবং এই সময়েই এখানে হাতির দেখা মেলে সহজে। শীত ও গ্রীষ্মে জল যখন শুকিয়ে যায়, হাতির দল তখন চলে আসে কাবিনি নদীর পাড়ে অথবা মূলে-হোল নদীর কাছে। কাবিনি নদীর পাড়ে মস্তিগুদিতে যদি আসা যায় কোনও এক গরমের বিকেলে, তাহলে চোখে পড়বে নদীর পাড় বরাবর কয়েকশো হাতি। এ দৃশ্য মনে করিয়ে দেবে আফ্রিকাকে।

হাতি ছাড়া এখানে দেখা মিলবে ভারতীয় গাউর, চার জাতের হরিণ, বন শুয়োর, হনুমান, শজারু, বনেট বাঁনর, শ্লথ ভাল্লুক, বাঘ, চিতাবাঘ, ঢোল, বনবেড়াল ও শেয়ালের।

চার জাতের হরিণের মধ্যে এখানে আছে চিতল হরিণ, কাকার হরিণ, চৌশিঙ্গা এবং মাউস ডিয়ার। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'মাউস ডিয়ার' (Mouse Deer)। ছোট, খরগোসের মাপের এই হরিণগুলোর রাতচরা স্বভাবের জন্যেই সাধারণত পর্যটকদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কারাপুরা পর্যটন অঞ্চলে শ্লথ ভাল্লুকের দেখা মেলে প্রায়ই। যদিও সর্বত্রই ওরা ঘুরে বেড়ায়। বান্দীপুর যদিও ভারতের আদি ন'টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্যতম। তবুও এখানে বাঘ দেখা বিরল ঘটনা। বাঘ এখানে বেশি দেখা যায় না ঠিকই। চিতাবাঘের দর্শন পাওয়া কিন্তু তেমন বিরল নয়।

এই জঙ্গলের অন্যতম আকর্ষণ 'ঢোল' (Dhole) বা বন্যকুকুর। দিনের আলোয় এখানে এই প্রাণীটিকে অন্যান্য যে কোনো জঙ্গল থেকে ভাল করে দেখা যায়।

বান্দীপুরে বিরল প্রাণীদের মধ্যে চিতাবেড়াল (Leopard Cat) ও 'রাস্টি স্পটেড ক্যাট' (Rusty Spotted Cat) এর সন্ধান মেলে। আর আছে ভোঁদড়।

এছাড়া কাবিনি নদীর পাড়ে দেখা যায় নানান জাতের জলের পাখি। এদের মধ্যে আছে পানকৌড়ি, নানা জাতের হেরন, গিরিয়াহাঁস (Garganey), বড় দীঘর (PinTail) প্রভৃতি পাখি। বান্দীপুরে আছে অনেক প্রজাতির শিকারি ও ঈগল জাতীয় পাখি।

তিলাজবাজ (Serpent Eagle), কোড়াল (Fishing Eagle), মৌবাজ (Honey Buzzard), হক্ ঈগল প্রভৃতি পাখির সংখ্যা এখানে যথেষ্ট। ছাই রঙা বনমুরগি, ছাই রঙা তিতির, ময়ূর প্রভৃতিও এখানে প্রচুর সংখ্যায় আছে। গাছের পাখিদের মধ্যে 'ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue Bird), চন্দনা, মালাবার হুইস্টলিং থ্রাশ, মালাবার পায়িড্ হর্নবিল, হাজারিকা (Minivet) প্রভৃতি দেখা যায়।

কাবিনি নদীর জলে সন্ধান মেলে কুমীর আর গো-সাপের।

স্থলের সরীসৃপদের মধ্যে এখানে আছে ময়াল, কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড় প্রভৃতি সাপ। বান্দীপুরের মতো সুন্দর রাস্তা বোধহয় আর কোনো জাতীয় উদ্যানের ভেতর নেই। মহীশূর-উটী হাইওয়ে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়েই চলে গেছে। এখানে ঘোরাবার জন্যে বনদপ্তরের জিপের ব্যবস্থা আছে; জঙ্গলের ভেতর যে, 'ওয়াচটাওয়ার' আছে, তাতে ওঠবার জন্যে আগেই অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। এ জঙ্গলের শ্রেষ্ঠ মরসুম জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস।

বান্দীপুরের থাকবার জন্যে বন বিভাগ ও পর্যটন বিভাগের অধীনে নানান রকম সুবন্দোবস্ত আছে।

"ফিল্ড ডিরেক্টর" প্রজেক্ট টাইগার, বান্দীপুর টাইগার রিজার্ভ, মহীশূর-4-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

নাগারহোল জাতীয় উদ্যান

বান্দীপুরের দক্ষিণ-পূর্বে কাবিনি নদীর যে বাঁধটি রয়েছে, তার অপর পারে 573 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে 1955 সালে স্থাপিত হয়েছিল 'নাগারহোল জাতীয় উদ্যান'। মহীশূরের 96 কিলো মিটার দূরের এই জঙ্গলটির নিকটতম বসতি 'কুটা'-র দূরত্ব মাত্র 7 কিলো মিটার। নাগারহোল অরণ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে লক্ষণতীর্থ ও কোব্রা নদী। কাবিনি নদীর উপর 1974 সালে একটি বাঁধ স্থাপন করা হয়েছিল। বাঁধের রিজার্ভারটির দৃশ্য মনোরম। এই বাঁধটিই নাগারহোলকে আলাদা করেছে বান্দীপুর থেকে।

নাগারহোলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। মৌসুমী বায়ু এখানে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এখানে শীতকাল। আর ফেব্রুয়ারি থেকে মে গ্রীষ্ম। নাগারহোলের গড় উচ্চতা 2,300 ফিট্।

শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় ধরনেরই জঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায় এ অরণ্যে। দক্ষিণ-পূর্বে বিরাজ করছে শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য আর উত্তর-পশ্চিমে আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বন। সেগুন, রোজউড, মাথি, পলাশ, নান্দি প্রভৃতি খুব উঁচু উঁচু জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বিরাজ করে সবুজ ঘাসের সমতল ক্ষেত্র আর বিশাল, বিশাল বাঁশঝাড়। সারা বছরই এই অঞ্চল সবুজ হয়ে থাকে।

নাগারহোলের জঙ্গলে নিশ্চিন্ত চিতাবাঘ

বান্দীপুরের মতোই এ জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ হাতি। প্রায়ই চোখে পড়ে হাতির বড় বড় পাল। শীত ও গ্রীষ্মে জঙ্গল যখন শুকিয়ে যায়, তখন হাতির পাল চলে আসে 'মুলে-হোল' নদীর পাড়ে পর্যটক আবাসের আশেপাশে।

বান্দীপুরের ভারতীয় গাউর দেখা পাওয়া বিরল হলেও, নাগারহোলে তো কিন্তু এই প্রাণীটির যথেষ্ট দেখা মেলে। 1968 সালে 'রিভারপেস্ট' রোগ সংক্রমণের ফলে অনেক গাউর মারা যায়। সংক্রমণ মুক্তির পর এখন আবার ধীরে ধীরে সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। এখন একসঙ্গে 25-30 টি গাউরের পাল প্রায়ই চোখে পড়ে। ভারতের অন্যান্য জঙ্গলের মতোই এখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে চিতল হরিণ। বাংলোর আশপাশে দিনে-রাতে প্রায় সবসময়ই দেখা মেলে অনেক চিতল হরিণের। কাকার হরিণের সংখ্যা এখানে নেহাত কম নয়। তাছাড়া মানুষ দেখতে ওরা এতই অভ্যস্ত যে নাগারহোল রোডের আশেপাশে খুব কাছ থেকে ওদের ছবি তোলা যায়, অন্য জঙ্গলে যা বেশ কষ্টসাধ্য। ছোট প্রাণীর জন্যও নাগরহোলের অরণ্য পরিচিতি। এখানে আছে দুষ্পাপ্র্য মাউস্ ডিয়ার (Mouse Deer), 'ব্ল্যাক নেপড্ হেয়ার', বনরুই (Pangolin), শজারু (Porcupine), মালাবার কাঠবেড়ালি (Malabar Squirrel), লজ্জাবতী বানর (Slender Loris), পাম্ সিভেট্ (Palm Civet) বানর শ্রেণীর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল 'বনেট বানর' (Bonnet Monkey)। যদিও বান্দীপুরকে বাঘ প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে, তবুও নাগারহোলে বাঘের সংখ্যা বান্দীপুরের থেকে বেশি। তবুও উত্তর বা মধ্য ভারতের মতো দিনের আলোয় এখানে বাঘ দেখা যায় না। কারাপুরা অঞ্চলে চিতাবাঘের দেখা পাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়; বরং বলা যেতে

পারে যে অন্যান্য যে কোনো জঙ্গলের তুলনায় চিতাবাঘের দেখা পাবার সম্ভাবনা এখানে অনেক বেশি। নাগারহোলের জঙ্গলে বনবেড়াল ছাড়া দেখা পাওয়া যায় দু'রকমের বিরল শ্রেণীর ছোট বেড়ালের। এরা হল চিতাবেড়াল (Leopard Cat) ও 'রাস্টি স্পটেড্ ক্যাট্' (Rusty spotted Cat)।

কাবিনি নদীর বাঁধের জলে মরসুমে ভিড় জমায় নানান জাতের পরিযায়ী হাঁস, এদের মধ্যে আছে চখাচখি (Rubby Shelduck), খুন্তেহাঁস (Shoveller) প্রভৃতি। এছাড়া এখানে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতের ওয়ার্বলার (Warbler), ফ্লাইক্যাচার (Flycatcher), থ্রাশ (Thrush) প্রভৃতি। এই জঙ্গলে দেখা যায় ফেয়ারি ব্লু-বার্ড (Fairy Blue-Bird), মালাবার ট্রগন (Malabar Trogon), সাদা কালো ধনেশ (Pied Hornbill) প্রভৃতি প্রায় দুশো প্রজাতির পাখি।

সরীসৃপের মধ্যে এখানে সন্ধান মেলে কুমীর, গোসাপ, বহুরূপী গিরগিটি (Chamelion), নানারকমের বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ প্রভৃতি।

জঙ্গলে ঘোরবার জন্যে এখানে জিপ ভাড়া পাওয়া যায় এবং থাকবার জন্যে এখানে আছে বিলাসবহুল 14 কামরা বিশিষ্ট কাবিনি জঙ্গল লজ।

থাকবার জন্য এ. সি. এফ. ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশান, এস. ডি. বাণীবিলাস রোড, মহীশূর-4-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ব্রহ্মগিরি অভয়ারণ্য

কর্ণাটকের দক্ষিণ দিকে কূর্গ-এর কাছে কেরালা সীমান্তে মিশ্র পর্ণমোচী যে জঙ্গলটি রয়েছে, 1974 সালে তাকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। এই অভয়ারণ্যের পূর্বে নাগারহোল জাতীয় উদ্যানের সীমানা। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এই জঙ্গলটির নিকটতম রেল স্টেশনটি হচ্ছে 75 কিলো মিটার দূরে কেরালা রাজ্যে অবস্থিত কান্নানোর এবং এখানে থেকে মহীশূরের দূরত্ব 135 কিলো মিটার।

এখানে মোটামুটিভাবে নাগারহোল্ বান্দীপুরের মতোই একই ধরনের বন্যপ্রাণী দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাতি, গাউর, বাঘ, চিতল, সম্বর, বনশুয়োর প্রভৃতি। এখানকার পাখিও বান্দীপূরের মতোই।

এ জঙ্গলে বন্যপ্রাণী দেখবার শ্রেষ্ঠ সময় অক্টোবর থেকে মে। জঙ্গলের মধ্যে যোগাযোগ ও সড়ক ব্যবস্থা এখানে খুব একটা উন্নত নয়।

এখানে থাকবার জন্য এ. সি. এফ. ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশান, এ. ডি. বাণীবিলাস রোড, মহীশূর-4-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ব্যানারঘাটা জাতীয় উদ্যান

ব্যাঙ্গালোর শহর দক্ষিণ দিকে মাত্র 28 কিলো মিটার দূরে পাহাড়ি উপত্যাকায় 104 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে ব্যানারঘাটা জঙ্গল। 1974 সালে ব্যানারঘাটাকে জাতীয় উদ্যানে উন্নীত করা হয়। শহরের খুব কাছেই অবস্থিত বলে এখানে সব সময়ই পর্যটকদের ভীড় থাকে, ফলে বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া এখানে দুঃসাধ্য। যদিও বন্যজন্তুর সংখ্যা এখানে খুবই নগণ্য, তবুও কিছু হাতি ও চিতল হরিণ দেখা যায়। তাছাড়া শ্লথ, ভাল্লুক ও চিতাবাঘ দেখবার সম্ভাবনা আছে এমন আছে।

জঙ্গলটি যদিও সারা বছরই খোলা থাকে, তবুও জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়া যেতে পারে।

ব্যানারঘাটা জাতীয় উদ্যানের ভেতরে একটি বাঘ ও একটি সিংহের সাফারী পার্ক রয়েছে।

থাকবার জন্য এ. সি. এফ. ব্যানারঘাটা, এন. পি. ব্যাঙ্গালোর-83-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

রঙ্গনাথিট্টু পাখিরালয়

এটা ভারতের একটি প্রাচীনতম অভয়ারণ্য। শ্রীরঙ্গাটনম দুর্গের পাশেই এর অবস্থান। কাবেরী নদীর ছোট্ট দ্বীপ শ্রীরঙ্গপাটনাম-এ টিপু সুলতানের যে রাজধানী ছিল, তার কাছে 1940 সালে স্থাপিত হয় রঙ্গনাথিট্টু পাখিরালয়। মহীশূর শহর থেকে এর দূরত্ব 18 কিলো মিটার। জুন থেকে এখানে বাসা বাঁধে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং তাদের বাচ্চা নিয়ে উড়ে চলে যায় অক্টোবর মাঝামাঝি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — খুন্তে বক (Spoon-bill), কাস্তে বক (White lbis) বড় ও মাঝারি বক (Large and Intermediate Egret), বাবুই (Streaked Baya) প্রভৃতি। এখানে শীতে কিছু পরিযায়ী হাঁসেরও দেখা মেলে। পাখি ছাড়া এখানে কুমীরেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

জুন থেকে অক্টোবর এখানে আসবার সময়। বেড়াবার জন্য এখানে নৌকা ভাড়া পাওয়া উপযুক্ত যায়। থাকবার জন্যে এখানে একটি গেস্ট হাউস আছে।

রঙ্গনাথিট্টুর খবরাখবরের জন্যে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে — এ. সি. এফ., ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশান, এস. ডি. বাণীবিলাস রোড, মহীশূর।

কেরালা

পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোল ঘেঁষে 77 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে বিরাজ করছে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় উদ্যান পেরিয়ার। 1895 সালে এই

পেরিয়ারের নির্জন হ্রদের পাড়ে বুনো হাতির পাল।

জঙ্গলের ভেতর বয়ে যাওয়া পেরিয়ার নদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া হয়; ফলে বাঁধের রিজার্ভার হিসাবে জন্ম নেয় 55 বর্গ কিলো মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি হ্রদ। এই হ্রদটি পেরিয়ারের বনভূমিতে জলের প্রধান উৎস। একদিকে এই লেক সৃষ্টির ফলে যেমন জলের তলায় তলিয়ে গেছে অরণ্যের বেশ কিছুটা অংশ, তেমনই এই লেক সৃষ্টি করেছে এক অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য যা প্রতি বছর আকর্ষণ করে লক্ষাধিক পর্যটককে। মার্চ ও এপ্রিল মাসে সাধারণভাবে যখন জঙ্গলের ভেতরকার জলাগুলি শুকিয়ে যায়; তখন জঙ্গলের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক প্রকট জলাভাব। ফলে জীবজন্তুরা বিশেষত হাতির পাল ভীড় জমায় হ্রদের পাড়ে। এই ঋতুতে দিনের যে কোনো সময় লেকের জলে নৌকাবিহার করলে হাতির স্নান করবার এক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

1934 সালে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের এই জঙ্গলটিকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। তখন নাম ছিল নেলিয়াপাত্তি অভয়ারণ্য। 1950 সালে এই অভয়ারণ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে এই বনভূমিটিই বিখ্যাত পেরিয়ার বনভূমি নামে পরিচিত। এখন পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত। অবশ্য বাঘের দর্শন এখানে পাওয়া খুব কদাচিৎ। বাঘ ও চিতাবাঘ ছাড়া পেরিয়ার ভরে আছে অসংখ্য বন্যপ্রাণীতে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাউস ডিয়ার, ভারতীয় গাউর, বুনোশুয়োর, চিতল, হরিণ, চিঙ্কারা, নীলগিরির হনুমান, খরগোস প্রভৃতি।

পাখির মধ্যে এখানে দেখা মেলে, বেনেবউ, ময়না, ভীমরাজ, 'ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue Bird), মালাবার ট্রাগন (Malabar Tragon), পানকৌড়ি, মানিকজোড় (Whitenecked Stork), মালাবার ট্রিপাই প্রভৃতি।

সরীসৃপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফ্লাইং স্নেক্ ও ফ্লাইং লিজার্ড। উড়ুক্কু ব্যাঙও এখানে খুব একটা বিরল নয়।

চিরহরিৎ এই বনভূমিতে বর্ষায় বিভিন্ন জাতের বুনো অর্কিডের দেখা মেলে। জঙ্গলের গাছের উচ্চতা এখানে একশো থেকে তিনশো ফিটের মধ্যে। কোথাও কোথাও জঙ্গল এত গভীর যে সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। এই অন্ধকার জঙ্গলে জন্মায় নানান রকম গুল্ম, ফার্ন প্রভৃতি।

পেরিয়ারের গোচারণও এখানে বিশেষ সমস্যা। 1974-75 সালে রিন্ডারপেস্ট অসুখ এখানে মহামারীর আকার ধারণ করে এবং কয়েক হাজার গাউরের মৃত্যু ঘটে। বনবিভাগ চেষ্টা করে চলেছে নিকটবর্তী গ্রামের গবাদি পশুকে প্রতিষেধক টীকা দেবার জন্যে। বর্তমানে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে।

পেরিয়ার সদর দপ্তর থিকেডিতে। কোচিন, ত্রিবান্দ্রম, মাদুরাই প্রভৃতি শহর থেকে থিকেডিতে নিয়মিত বাস যোগাযোগ আছে।

মানাকাউয়ালা, মুল্লাকুড়ি ও থাল্লাকুড়িতে বনদপ্তরের রেস্ট হাইস আছে। তাছাড়া কেরালা রাজ্য পর্যটন বিভাগেরও থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। যোগাযোগ করতে হবে — ফিল্ড ডিরেক্টর, পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভ, বিকড়ি, কেরালা।

সায়লেন্ট ভ্যালি অভয়ারণ্য

পালঘাট রেল স্টেশনের 75 কিলো মিটার দূরে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী বাঁচাবার তাগিদে 1984 সালে স্থাপিত হয় "সায়লেন্ট ভ্যালি জাতীয় উদ্যান"। চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই নির্জন উপত্যকাটির আয়তন 90 বর্গ কিলোমিটার।

চিরহরিৎ এই বনভূমিতে সন্ধান পাওয়া যায় খুব বিরল গাছপালা ও নানান রকমের লতাপাতার।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে এখানে আছে বুনো হাতি, সিংহ-পুচ্ছ বাঁদর (Liontail Macaque), এমন কি বাঘ। কিছু বিরল প্রজাতির পাখিও আছে "সায়ালেন্ট ভ্যালি"-তে।

বাসে বা ট্রেনে পালঘাট এসে আবার বাস বদলে বা ট্যাক্সি নিয়ে আসা যায় "সায়লেন্ট ভ্যালি"-তে।

থাকবার জন্য এখানে চার শয্যা বিশিষ্ট একটি বিশ্রামগৃহ আছে।

থাকবার জন্য ডি. এফ. ও. পালঘাট, কেরাল - 678009-কে যোগাযোগ করতে হবে।

পরবিকুলাম অভয়ারণ্য

1962 সালে 285 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল এই অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে মূলত তিনটি রিজার্ভারকে ঘিরে; এগুলি হল, পরমবিকুলাম, থুনাকাডাভু ও পেরুডারিলাল্লান। এই প্রত্যেকটি জলাশয়ে আছে অসংখ্য কুমীর।

এই অভয়ারণ্যটি প্রধানত পর্ণমোচী বৃক্ষের গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গলে বেশ কিছুটা এলাকা নিয়ে সেগুন গাছ রোপণ করা হয়েছিল।

এই অভয়ারণ্যের নিকটতম শহর ও রেল স্টেশন পোল্লাচি। পোল্লাচির দূরত্ব 30 কিলো মিটার এবং কোয়েম্বাটুরের দূরত্ব 100 কিলো মিটার। কোয়েম্বাটুর থেকে রেলে বা বাসে পোল্লাচি হয়ে পরবিকুলামে আসা যায়।

কেরালার মধ্যে এখানেই সর্বাধিক সংখ্যায় ভারতীয় গাউর আছে। তাছাড়া আছে সামান্য সংখ্যায় বাঘ ও চিতাবাঘ, সম্বর, চিতল, সিংহ-পুচ্ছ বাঁদর প্রভৃতি।

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আসা যায়।

এই অভয়ারণ্যে বেড়াবার জন্যে গাড়ি এবং নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।

থাকবার জন্য থুনাকাডাভু, থেল্লিকাল এবং এলাথোড়-এ বনবিভাগের বাংলো আছে।

থাকবার জন্য যোগাযোগা করতে হবে ডি. এফ. ও. টি. পি ডিভিশান, থুনাকাডাভু, ভায়া — পোল্লাচি, কেরাল-তে।

পেপ্পারা অভয়ারণ্য

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোল ঘেঁসে 53 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে 1983 সালে ঘোষিত হয় পেপ্পারা অভয়ারণ্য। এই মিশ্র বনভূমি প্রধানত পাহাড়ি অঞ্চল।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে পেপ্পারার জঙ্গলে পাওয়া যায় হাতি, সম্বর, সিংহ পুচ্ছ বাঁদর, চিতাবাঘ প্রভৃতি। এছাড়া আছে অসংখ্য প্রজাতির সুন্দর সুন্দর পাখি সারা বছরই এই জঙ্গলে যাওয়া যেতে পারে।

এখানে চার শয্যাবিশিষ্ট একটি গেস্ট হাউস আছে এবং পনমুড়েতে পর্যটন আবাস গড়ে উঠেছে।

ত্রিবান্দ্রাম থেকে 48 কিলো মিটার দূরের এই জঙ্গলে বাসে করে আসা যায়।

থাকবার জন্য ডি. এফ. ও. ত্রিবান্দ্রাম ফরেস্ট ডিভিশান ত্রিবান্দ্রম, কেরাল-কে লিখতে হবে।

ওয়াইনাদ অভয়ারণ্য

1973 সালে 344 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে ঘোষিত হয় ওয়াইনাদ অভয়ারণ্য। এই জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিমে নাগারহোল। পশ্চিম দিকে ওয়াইনাদ এবং দক্ষিণে বিরাজ করছে মুডুমালাই অভয়ারণ্য।

পশ্চিমঘাটের এই গভীর বনভূমিতে আছে হাতি, চিতল হরিণ, গাউর সম্বর এবং যথেষ্ট সংখ্যায় শ্লথ ভাল্লুক। এখানকার পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালাবার হাঁড়িচাচা মালাবার ট্রেগন, ময়না প্রভৃতি।

এই জঙ্গলের ভেতরে ভাল সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।

কালিকট রেল স্টেশনের 110 কিলো মিটার দূরের এই অভয়ারণ্যে আসবার জন্যে কালিকট ও মহীশূর থেকে বাস পাওয়া যায়।

মানাটৌড়ি এবং সুলতানস্ ব্যাটারিতে রেস্ট হাউস আছে।

ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস এখানে আসার জন্য উপযুক্ত সময়।

থাকবার জন্য ডি. এফ. ও. ওয়াইনাদ, পো: — মানাটৌড়ি, কেরাল-কে লিখতে হবে।

থাট্টেক্কাড় বার্ড অভয়ারণ্য

কোচিনের 70 কিলো মিটার দূরে পর্ণমোচী গাছের যে জঙ্গলটি রয়েছে, তার 25 বর্গ কিলো মিটার এলাকা নিয়ে 1983 সালে ঘোষিত হয়েছিল থাট্টেক্কাড় বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি। পেরিয়ার নদীর দুটি শাখার মধ্যবর্তী ভূমিতে অবস্থিত এই জঙ্গলে দেখা মেলে অসংখ্য প্রজাতির পরিযায়ী ও জলার পাখি। পাখির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিলোন ফ্রগ্‌মাউথ্ (Ceylon Frogmouth) ও রোজ-বিল রোলার। বন্যপ্রাণীর মধ্যে আছে উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী ও সিংহ-পুচ্ছ বানর। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে আসা যায়।

কোচিন থেকে অলওয়ে হয়ে বাসে এখানে আসা যায়।

থাকবার জন্যে এখানে বিশ্রাম গৃহ আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা — ডি. এফ. ও. মলয়াথুর ফরেস্ট ডিভি:, পোঃ—কোডানাড়, ভায়া — পেরুম্বাড়ুর, কেরাল।

গোয়া

ভগবান মহাবীর জাতীয় উদ্যান ও মোলেম অভয়ারণ্য

ডাবোলিন বিমান বন্দরের 80 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত মোলেম অভয়ারণ্যটি 255 কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে স্থাপিত হয়। আর 1974 সালে 107 বর্গ কিলো মিটার অরণ্য নিয়ে স্থাপিত হয় ভগবান মহাবীর জাতীয় উদ্যান।

এই জঙ্গল দুটি প্রধানত মিশ্র পর্ণমোচী। বন্যপ্রাণীর মধ্যে এখানে চিতাবাঘ, শ্লথ্ ভাল্লুক, চিতল প্রভৃতি দেখা যায়। তাছাড়া আছে অসংখ্য পাখি।

অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে যাওয়া যেতে পারে।

থাকবার জন্যে বেশ কয়েকটা ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস ও কটেজ আছে।

এখানে থাকবার জন্যে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার, (ডব্লু. এল.) মোলেম, গোয়া-র কাছ থেকে অনুমতিপত্র মেলে।

কোটিগাঁও অভয়ারণ্য

পশ্চিমঘাট পর্বত যেখানে কর্ণাটক সীমান্তে তটভূমিকে স্পর্শ করেছে, সেখানে 105 বর্গ কিলো মিটার পার্বত্য অরণ্য নিয়ে 1968 সালে ঘোষিত হয় কোটিগাঁও অভয়ারণ্য।

এ জঙ্গলের নিকটতম রেল স্টেশন মাদ্‌গাঁও-এর দূরত্ব 48 কিলো মিটার আর ডাবোলিনের দূরত্ব 78 কিলো মিটার।

এখানে কিছু চিতাবাঘ, স্লথ্ ভাল্লুক, সম্বর, বনরুই (Pangolin), চিতল প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।

অনুমতির জন্যে লিখতে হবে — রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার, (ডব্লু. এল.) কাওয়াকোনা, গোয়া।

বোন্ডলা অভয়ারণ্য

পোন্ডার 25 কিলো মিটার দূরে চিতাবাঘ, বনশুয়োর ও সম্বরকে রক্ষা করবার জন্যে 1969 সালে স্থাপিত হয় বোন্ডলা অভয়ারণ্য।

অক্টোবর থেকে মার্চ এখানে আসবার ভাল সময়। পানাজি ও পোন্ডারের মধ্যে নিয়মিত বাস চলাচল করে। থাকবার জন্য এখানে কটেজ ও ডর্মিটরি আছে। খাবারও ব্যবস্থা রয়েছে।

থাকবার জন্য এ. সি. এফ., বোন্ডলা, গোয়া-র কাছ থেকে অনুমতিপত্র মেলে।

গুজরাত

গির জাতীয় উদ্যান

এশিয়ার সিংহ (*Panthera leo parsica*)-এর শেষ ঘাঁটি গুজরাত রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত গির অরণ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুজরাতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার ফলে এখানে সিংহের খাদ্য ভীষণভাবে হ্রাস পায় এবং সিংহ হয়ে ওঠে মানুষ খেকো। এর শোচনীয় পরিণতিতে সিংহ ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে এবং 1913 সালে গির অঞ্চলে সিংহের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র 20 টির কাছাকাছি। যাই হোক জুনাগড়ের নবাব

বিশ্রামরত সিংহের এখন একমাত্র বাসস্থান গির অরণ্য।

এই জঙ্গলটিকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেন এবং স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এই জঙ্গলের রক্ষক। বর্তমানে এই অভয়ারণ্যে সিংহের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় আড়াইশো।

1412 বর্গ কিলো মিটার এই জঙ্গলটিকে 1965 সালে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তবে মোট এলাকার মাত্র 10 ভাগ জমি [illegible]।

গির জঙ্গলের চরিত্র প্রধানত মিশ্র পর্ণমোচী। প্রধান গাছের মধ্যে এখানে রয়েছে, জাম, পলাশ বিভিন্ন জাতের আকাশমনি, বিশেষত বাবলা, কুল ও বট।

কমলেশ্বর বাঁধের আশেপাশে কুমীরের দেখা পাওয়া যায়। এছাড়া সাসনে একটি কুমীর প্রকল্প রয়েছে। গিরে বন্যজন্তু দেখাবার শ্রেষ্ঠ রাস্তাগুলি হল সাসান থেকে বভিল এবং কানকাই আর সাসান থেকে চোদাভড়ি এবং কমলেশ্বর বাঁধ।

এই জঙ্গল পক্ষী সম্পদে পরিপূর্ণ। সারপেন্ট ঈগল, বনেলি ঈগল, হুতম প্যাঁচা, ক্রেসটেড সুইফট, কপারস্মিথ, তিতির বটের প্রভৃতি পাখি এই জঙ্গলে দেখা যায়।

অন্যান্য জঙ্গলের মতো গিরেও বন্য জন্তু দর্শনের সবচেয়ে ভাল সময় সূর্যোদয়ের ঠিক পরে এবং সূর্যাস্তের ঠিক আগে। জঙ্গলে ঘোরবার জন্যে বন-দপ্তরের জিপ পাওয়া যায়। গির অরণ্যের মধ্যে মালধারী উপজাতির বাস। এই অতিথিপরায়ণ উপজাতির একমাত্র জীবিকা গোচারণ এবং এদের পোষা মোষ এই অরণ্যের সিংহের অন্যতম প্রধান খাদ্য। মালধারীদের কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া গ্রাম পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বন্য সিংহের সঙ্গে মানুষের এই সহাবস্থান সত্যিই আশ্চর্য হবার মত।

এই জঙ্গলের প্রধান সমস্যা, জঙ্গলের ভেতর জনসংখ্যার আধিক্য এবং গোচারণ। এই জঙ্গলে প্রতিদিন প্রায় কুড়ি হাজার গবাদি পশু বিচরণ করে যার ফলে হরিণ জাতীয় প্রাণীদের সচারচর দেখা মেলে না। এই গোচারণের ফলে বন্য জন্তুদের মধ্যে নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি এবং মহামারী দেখা যায়।

এখানে থাকবার জন্যে বনদপ্তরের বিশ্রাম গৃহ এবং আই. টি. ডি. সি.-র অধীনে বাংলো আছে।

যোগাযোগ করতে হবে কনজারভেটার অব ফরেস্ট, সরদার বাগ, জুনাগড়, গুজরাট।

ভেলাভাদার অভয়ারণ্য

1969 সালে, কৃষ্ণসার হরিণকে রক্ষা করবার জন্য স্থাপিত হয় 30 বর্গ কিলো মিটারের এই অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্য ভরে আছে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদে।

এই অভয়ারণ্যে কৃষ্ণসারের ঘনত্ব সব থেকে বেশি।

কালিয়ার বন ভবন বিশ্রাম গৃহে থাকবার ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ করতে হবে, রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার, ভেলাদার অভয়ারণ্য, ভেলাভাদার, পো: ভাল্লাভিপুর, গুজরাট।

ধাংগাধ্রা অভয়ারণ্য

রাজকোট থেকে 140 কিলো মিটার এবং আমেদাবাদ থেকে 209 কিলো মিটার দূরে লিটল রান্ অব কচ্ছ-এর 4,840 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল জুড়ে 1973 সালে স্থাপিত হয় ধাংগাধ্রা অভয়ারণ্য। কচ্ছের রান শক্ত শুকনো কাদার ভুভাগ নিয়ে গঠিত। এখানকার নোনা আবহাওয়ায় গাছপালা নেই বল্লেই চলে। বর্ষাকালে কিছু কিছু অংশে ঘাস জন্মায়। স্থানীয় ভাষায় এই অঞ্চলকে বলে 'বেট্'।

কচ্ছের রানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বুনো গাধা (Asiatic Wild Ass)। এই জাতীয় গাধা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। বর্তমানে এদের সংখ্যা আড়াইশোর কাছাকাছি। স্থানটি ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত হবার জন্য গাধারা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের মধ্যে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ পায়। বর্ষায় যখন কচ্ছের রান জলে ডুবে যায় এবং কাদা নরম হয়ে যায়, গাধারা তখন 'বেট্'-এর ঘাস জমিতে আশ্রয় নেয়। এই ভূ-ভাগ অপেক্ষাকৃত উঁচু। বুনো গাধা ছাড়া এখানে কিছু কৃষ্ণসার ও চিঙ্কারার সন্ধান মেলে। মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে এখানে শেয়াল, নেকড়ে ও মরুভূমির বেড়ালের দেখা পাওয়া যায়।

এখানকার সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার হাজার ফ্লেমিংগো (Flemingo) উড়ে আসে।

বর্ষার ক'মাস বাদে এখানে যে কোনো সময় যাওয়া যেতে পারে। তবে শীতকালই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ধাংগাধ্রার নিকটতম শহর ভূজেই থাকবার বন্দোবস্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা — ডি. এফ.ওঙ্গ, ধাংগাধরা ওয়াইল্ড এ্যাস স্যাংচুয়ারী, ভুজ, গুজরাত।

যশোর শ্লথ ভাল্লুক অভয়ারণ্য

গুজরাত ও রাজস্থানের সীমান্তে 1978 সালে 69 বর্গমাইল জঙ্গল নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল এই অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্যের নিকটতম শহর পালানপুরের দূরত্ব 28 কিলো মিটার ও নিকটতম রেল স্টেশন ইক্‌বাল 10 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

নাম শুনলেই বোঝা যায় যে এই অভয়ারণ্যের প্রধান আকর্ষণ শ্লথ ভাল্লুক। তাছাড়া আছে কিছু নীলগাই ও চিতাবাঘ।

জঙ্গলটিতে পাহাড়ের গায়ে কাঁটা গাছ ও গুল্মের ঝোপ বিশিষ্ট।

এখানে বেড়াবার শ্রেষ্ঠ সময় নভেম্বর থেকে মার্চ।

থাকবার জন্যে এখানে রেস্ট হাউস আছে।

অনুমতির জন্যে লিখতে হবে - কনজারভেটার অব ফরেস্ট, গান্ধীনগর, গুজরাট-১৬

মেরিন জাতীয় উদ্যান

176 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল জুড়ে 1980 সালে স্থাপিত হয় এই জাতীয় উদ্যান।

এখানে প্রধান দর্শনীয় জীব তিন শ্রেণীর কচ্ছপ। এরা হ'ল, — সবুজ সামুদ্রিক কাঠা, চামড়াওয়ালা পিঠের কচ্ছপ ও জলপাই রং-এর রিড্‌লে কচ্ছপ। এছাড়া এখানে অন্যান্য সামুদ্রিক জীবেরও দেখা পাওয়া যায়।

এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস।

এখানে ষাটটি শয্যাবিশিষ্ট দুটি বিশ্রাম গৃহ আছে।

ডাইরেক্টর, মেরিন ন্যাশানাল পার্ক, প্রদর্শন গ্রাউন্ড, জামনগর, গুজরাত-এর কাছ থেকে থাকবার অনুমতি নিতে হয়।

নল সরোবর অভয়ারণ্য

আমেদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে 115 বর্গ কিলো মিটার জলাভূমি নিয়ে বিরাজ করছে গুজরাটের 'ভরতপুর' নল সরোবর অভয়ারণ্য। 1969 সালে একে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়।

ট্রেনে আমেদাবাদ গিয়ে উদ্যান নামক স্থান থেকে বাসে করে ওখানে যাওয়া যায়।

এখানকার হ্রদে শীতের অতিথি হয়ে আসে, ফ্লেমিংগো (Flemingo), সরাল (Lesser Whistling Teal), খুন্তে হাঁস (Shovelar), রাঙামুড়ি (Common Pochard) ইত্যাদি। এখানে অবশ্য কোনও পাখি বাসা বাঁধে না।

নল সরোবরে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

এখানে একটি "ফরেস্ট লজ" আছে।

ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, নল সরোবর অভয়ারণ্য, পো: ডেকারিয়া, আমেদাবাদ, গুজরাত-এর কাছ থেকে এখানে থাকবার অনুমতি পাওয়া যাবে।

জম্মু ও কাশ্মীর

দাচিগাম জাতীয় উদ্যান

"দাচিগাম" শব্দটির অর্থ "দশটি গ্রাম"। 1910 সাল থেকে 1935 সালের মধ্যে দশটি গ্রামকে এই জঙ্গলের বাইরে স্থানান্তরিত করা হয় — সেই থেকে নাম 'দাচিগাম"। শ্রীনগর থেকে মাত্র বাইশ কিলো মিটার দূরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ডাললেক বরাবর কাশ্মীরের নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে 140 বর্গ কিলো মিটার জঙ্গল নিয়ে বিরাজ করছে দাচিগাম। 1910 খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরের মহারাজা পরিবেশ বাঁচাবার তাগিদে প্রথম এই জঙ্গলটি রক্ষা করবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। স্বাধীনতার পর এই মনোরম বনভূমিকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় এবং 1981 সালে দাচিগাম লাভ করে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা।

দাচিগাম ধাপে ধাপে উঠে গেছে 5,500 ফিট থেকে 14,000 ফিট উচ্চতায়।

দু'দিকের দুটি গভীর খাঁড়ি এই জাতীয় উদ্যানটির প্রাকৃতিক সীমানা।

পর্বত শীর্ষে বিরাজ করছে 'মারসার লেক'। এই মারসার থেকেই বেরিয়েছে 'দাগওয়ান' নদী।

দাচিগামের বিভিন্ন উচ্চতায় দেখা মেলে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ, বন্যজন্তু আর পাখির। বড় পাতাওয়ালা উঁচু উঁচু গাছের গভীর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বিরাজ করছে ঘাসের সবুজ জমি, আবার কোথাও পর্ণমোচী গাছের বন; পাহাড়ের ঢালে কোথাও বা রয়েছে রুক্ষ উদ্ভিদবিহীন পাথর, আবার কোথাও খোঁজ মেলে কাঁটা ঝোপের। বসন্তের আগমনের সাথে সাথে নীচের দিকে জন্মাতে আরম্ভ করে বুনো চেরী, পিচ, আপেল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল যা আকর্ষণ করে অজস্র প্রজাতির পাখিকে। নীচের উপত্যকার প্রধান গাছগুলি হল —"ওক", "উইলো" "পপ্‌লার", "বার্চ", "বাদাম" প্রভৃতি। হেমন্তে এই সব গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে। বনময় তখন লাল আর হলুদের বর্ণচ্ছটা। গাছের তলাগুলোর পাতা হয় ঝরাপাতার গালিচা। শীত আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বনভূমি পাতাবিহীন, শুষ্ক হয়ে যায়। তখন চারিদিকে বিরাজ করে এক নিঃশব্দ বিষণ্ণতা।

ঋতুর এই পট-পরিবর্তন দাচিগামের মতো আর কোথাও ধরা পড়ে না।

আবার দাচিগামের জঙ্গলে শীত আসে তাড়াতাড়ি আর যায় দেরীতে। কিন্তু যে অল্প কয়েক মাস গ্রীষ্ম থাকে, সেই সময়টুকু দাচিগাম স্বর্গীয় রূপ ধারণ করে।

রৌদ্রজ্জ্বল বিস্তীর্ণ সবুজের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলে স্বচ্ছ জলের পাহাড়ি ঝোরা, ফোটে রঙ-বেরঙের ফুল যা আকর্ষণ করে ছোট বড় নানান জাতের প্রজাপতিকে। গাঢ় নীল আকাশের নীচে পাতার বাহার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সিলভার বার্চ। সমস্ত বনভূমি তখন সোনালি-রূপালি, সবুজে-সুনীলে মাখামাখি।

এ জঙ্গলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাসিন্দা হাঙ্গুল (Hangul)। অবলুপ্ত প্রায় এই লাল হরিণের শেষ আস্তানা এই জঙ্গল। নির্বিচারে হত্যা এবং হাজার হাজার গবাদি পশুর অবাধ বিচরণের জন্যে এই কাশ্মীরি হরিণ-এর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়ে আসছিল। আজ পর্যন্ত এই সমস্যা রয়েই গেছে। তবুও বনদপ্তরের আপ্রাণ চেষ্টায় হাঙ্গুলের সংখ্যা তিনশো থেকে বেড়ে পাঁচশোরও বেশি হয়েছে।

কাশ্মীরি হরিণ ছাড়া এখানে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেখা মেলে হিমালয়ের কালো ভাল্লুক-এর। গাছের ডালে ডালে কর্মব্যস্ত থাকে হনুমানের ছোট-বড় দল। কদাচিৎ দেখা মেলে চিতাবাঘের। এছাড়া আছে শেয়াল, বনশুয়োর, চিতাবেড়াল প্রভৃতি।

রঙ-বেরঙের পাখির মেলা দাচিগামে। যত্রতত্র উড়ে বেড়ায় ব্লু-ম্যাগপাই (Yellowbilled Blue Magpie), সোনাবউ (Golden Oriole), নানান জাতের লাফিং থ্রাস (Laughing Thrush), লালগির্দি (Redstart), রুবি থ্রোট (Ruby Thorat), হাজারিকা (Scarlet Minivet), দুধরাজ (Paradise Flycatcher), ছোট-বড় প্যাঁচা, বিভিন্ন জাতের রামগাংরা (Tit), ওয়ার্বলার (Warbler), হিমালয়ান পায়িড্ উডপেকার (Himalayan Pied Woodpecker), রেড ব্রাউড ফিঞ্চ (Redbrowed Finch) প্রভৃতি। আবার দাচিগামের সংগারগুলু ভ্যালি-তে দেখা পাওয়া যায় কোকলাস্ ফেজেন্ট। শকুনের মধ্যে বিয়ার্ডেড ভালচার (Bearded Vulture) ও হিমালয়ান গ্রিফন (Himalayan Griffon) উল্লেখযোগ্য।

জঙ্গলের মধ্যে ঘোরবার জন্যে বনদপ্তরের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলের ভিতর নুম্বাল বীটের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে একমাত্র পাকা রাস্তা। এ জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঘোরাই শ্রেয়।

শ্রীনগর থেকে মাত্র কুড়ি মাইলের মধ্যে এই জঙ্গলটির আরো সুদৃঢ় রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। গবাদি পশুর বিচরণ যদি আরো কড়া হাতে বন্ধ করা না যায়, না হলে দাচিগামের পরিবেশ বাঁচানো কঠিন। চোরা শিকারি অনেক কমে গেলেও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে বনদপ্তরকে আরো কঠোর হতে হবে।

আপনি যেতে চাইলে চীফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ারডেন, শ্রীনগর, কাশ্মীর কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে।

ঝাড়খন্ড

পালামৌ ব্যাঘ্র প্রকল্প

1960 সালে দায়ুদ খান সৈন্য সামন্তসহ পালামৌর বনে কামানের গোলা নিয়ে যাবার জন্য বন কেটে রাস্তা তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। পালামৌ আজও যুদ্ধে লিপ্ত। তবে যুদ্ধের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। বন ও বন্যপ্রাণী প্রকৃতিতে বাঁচাতে পালামৌ এখন যুদ্ধে রত রয়েছে হিংস্র শিকারি ও মানুষের সীমাহীন লোভের বিরুদ্ধে। ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের প্রথম ন'টি প্রকল্পের মধ্যে পালামৌ একটি। এ ব্যাঘ্র প্রকল্পের মোট আয়তন 979 কিলো মিটার যার মধ্যে কোর বনাঞ্চল 200 বর্গ কিলো মিটার।

ছোটনাগপুরের উত্তরভাগে গড়ে ওঠা এই উঁচু নিচু বনভূমিতে যেসব গাছ দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান হল শাল, মহুয়া, পলাশ, ইউক্যালিপটাস, বেত, বাঁশ, চন্দন, জাম, কুল এবং নানান ধরনের কাঁটা গাছ।

এখানে সারাদিনই প্রায় বন্য জন্তুর দেখা মেলে। ভোরে ঘুম ভেঙেই দেখা যায় টুরিস্ট লজের পাশে পালে পালে হরিণ। কোয়েল নদীর তীরে, ঘন জঙ্গলে অজস্র হাতি, গাউর,

পালামৌ-এর শালের নীবিড় বনভূমির হাতছানি প্রকৃতিপ্রেমীদের মাতাল করে।

নীলগাই, সম্বর, চিতল, বনবিড়াল, শিয়াল, ভাল্লুক, শজারুর সন্ধান মেলে। পাওয়া যায় বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি। বিভিন্ন পক্ষীকুলও আস্তানা গেড়েছে এইখানে। নানান জাতের,

নানান রঙের পাখি তাদের মিষ্টি, সুরেলা ডাকে জায়গাটাকে মাতিয়ে রেখেছে। এখানে আছে দামা (Orangebellied Ground Thrushs), বুলবুল (Redvented Bulbul), হাজারিকা (Scarlet Minivet), বেনেবউ (Blackheaded Oriole), সোনাবউ (Golden Oriole), ঘুঘু (Dove), চন্দনা (Alexzandrine Parakeet), হট্টিটি (Redwalted Lapwing) প্রভৃতি পাখি। অদূরে ঔরাঙ্গাবাদ নদীর তীর ঘেঁষে দুটো দুর্গের ধ্বংসাবশেষও ঘুরে দেখে আসা যায়।

ভারতে এইখানেই প্রথম 1932 সালে বাঘের সংখ্যা গণনা করা হয়। 1973 সালে এটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত হয়। বর্তমানে চোরাশিকারিরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে এখানে।

এই জঙ্গল ঘুরে দেখবার জন্য বন দপ্তরের জিপ এবং হাতি ভাড়া পাওয়া যায়। নিজস্ব গাড়িতেও জঙ্গলের ভিতর যাওয়া যেতে পারে। এখানকার দুটি ওয়াচ টাওয়ার থেকে বন্য জন্তুকে খুব ভালভাবে দেখা যায়। উৎসাহী ব্যক্তিদের জঙ্গলে যাবার সবচেয়ে ভাল সময় হল অক্টোবর থেকে মে। বেতলাতে একটি পর্যটক নিবাস এবং একটি বন দপ্তরের রেস্ট হাউস আছে। জঙ্গল ঘুরে দেখার ও রেস্ট হাউসে থাকার অনুমতি দিয়ে থাকেন ফিল্ড ডাইরেক্টর, প্রজেক্ট টাইগার রিজার্ভ, ডাল্টনগঞ্জ, বিহার।

গৌতম বুদ্ধ অভয়ারণ্য

1970 সালে স্থাপিত এই জঙ্গলটি গয়া থেকে প্রায় 40 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত। প্রথমে এই জায়গাটি ব্যক্তিগত মালিকানায় শিকারের আদর্শ জায়গা হিসাবে রক্ষিত ছিল। পরে প্রায় 20 বছর ধরে এখানে পশুচারণ করা হয়। প্রায় 259 বর্গ কিলো মিটার জায়গা জুড়ে এই অরণ্যের বেশির ভাগই শালগাছ, মাঝে মাঝে মাঝারি ও ছোট গুল্মো জাতীয় গাছে ভরা।

বনভূমি ও তার গাছপালা অনুযায়ী এখানে বাস করে ছোট এবং মাঝারি ধরনের স্তণ্যপায়ী প্রাণী যেমন চিতাবাঘ, চিঙ্কারা, চিতল, বনবিড়াল, ভাল্লুক এবং হরিণ। আগে এখানে বাঘেরও দেখা পাওয়া যেত। শোনা যায় 1936 সালে শেষ বাঘটিকে গুলি করে মারা হয়।

বিহারের সঙ্কটমুখী অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব এই জঙ্গলেও পড়েছে। শিকার এবং গাছ কাটার হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

জঙ্গল দেখার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময় হল ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল। গয়া ফরেস্ট ডিভিশনের ডি. এফ. ও. সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গলে ঢোকার এবং এর মধ্যে যে একটি মাত্র রেস্ট হাউস আছে সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

মহুয়াদাঁড় অভয়ারণ্য

রাঁচী থেকে প্রায় 150 কিলো মিটার দূরে মহুয়াদাঁড় অভয়ারণ্য প্রায় 63 বর্গ কিলো মিটার জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। বরহা নদী এই অরণ্যের মধ্যে এক গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে।

নেকড়ে (Indian wolf), এই জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া নানান ধরনের পাখি যেমন, ভীমরাজ (Racket-Tail drongo), কেশরাজ (Haircrested drongo), দোয়েল, পাপিয়া (Hawk Cuckoo), তোল মুনিয়া (Spotted Munia), বন মোরগ ইত্যাদি। বন্যপ্রাণীর মধ্যে বাইসন, বুনোশুয়োর, বনবিড়াল, ভাল্লুক ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। গাছের মধ্যে শাল, পিয়াল, মহুয়া, পলাশ ইত্যাদির আধিক্য আছে।

জঙ্গলের মধ্যে দুইটি চার শয্যা বিশিষ্ট রেস্ট হাউস আছে। রেলপথে চিপাদোহর থেকে ৫০ কিলো মিটার দূরে এই অরণ্য।

ডালমা অভয়ারণ্য

জামসেদপুর-রাঁচীর জাতীয় সড়কের দুধারে ডালমা- পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। এখানেই জামসেদপুর থেকে প্রায় 12 কিলো মিটার দূরে 193 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল জুড়ে 1976 সালে গড়ে উঠেছে এই অভয়ারণ্য।

সুবর্ণ রেখা নদীর পাড় ঘেঁসে এই মিশ্র পর্ণমোচী ও শালের উঁচু নিচু বনভূমি হাতির জন্য বিখ্যাত। এছাড়া এখানে আছে নেকড়ে, মাউস ডিয়ার, শ্লথ ভাল্লুক, চিতল ইত্যাদি।

বর্ষাকালে এখানকার প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোরম পাহাড়ের মাথাগুলো মেঘে ঢেকে থাকে, এখানে ওখানে ঝরণার সৃষ্টি হয়, সবুজে চারিদিক ভরে যায়। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের উচ্চতা 3,060 ফুট। এই জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখার আর উপভোগ করার সবথেকে ভাল সময় হল ডিসেম্বর থেকে মার্চ।

থাকার জন্য এখানে তিনটি রেস্ট হাউস আছে। দুটি ঝাড়খন্ড বনবিভাগের ও পর্যটন বিভাগের একটি পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগের। রাঁচী থেকে এখানে থাকবার ও জঙ্গলে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

যোগাযোগের ঠিকানা, ডি. এফ. ও. ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন রাঁচী।

হাজারীবাগ জাতীয় উদ্যান

রাঁচীর অনতিদূরে হাজারীবাগ জেলায় 184 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল জুড়ে হাজারীবাগ জাতীয় উদ্যান গড়ে উঠেছে। এখানকার জঙ্গল প্রধানত শাল গাছের। 1954 সালে স্থাপিত এই জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণ কতটুকু সার্থক হয়েছে তা বলা মুশকিল। উঁচু নিচু এই বনভূমির মাঝে মাঝে দু-একটি জলাধার আছে।

ছোটনাগপুর উপত্যকায় অবস্থিত এই জঙ্গলের আবহাওয়া মোটামুটি স্বাস্থ্যপ্রদ। জঙ্গল ঘুরে দেখার সব থেকে ভাল সময় হল অক্টোবর থেকে এপ্রিল। জঙ্গল ঘুরে দেখার জন্য ঘন্টা হিসাবে ভাড়াতে গাড়ি পাওয়া যায়। হাজারীবাগ টাউন থেকে এই অরণ্যের দূরত্ব 20 কিলো মিটার। সদর হাসপাতাল রোড থেকে 30 টাকায় বন্য জন্তু দেখবার সুব্যবস্থা আছে। অরণ্যে ঢোকার অনুমতি দিয়ে থাকেন ডি. এফ. ও. হাজারীবাগ। পোখারিয়াতে এই জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ তোরণ।

এই অরণ্যটি আগে রামগড়ের রাজার নিজস্ব শিকারস্থল ছিল। এখানে যেসব বন্য প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় তা হল চিতল, বুনোশুয়োর, চিতা, সম্বর ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এ জঙ্গলে বণ্যপ্রাণীর অবস্থা বেশ সংকটময়।

তামিলনাড়ু

মুডুমালাই অভয়ারণ্য

নীলগিরি পর্বতমালার উত্তর-পূর্ব ঢালে রয়েছে তিনটি অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান। ওয়াইনাদ্, বান্দিপুর এবং সবচেয়ে দক্ষিণে মুডুমালাই। মুডুমালাই-এর অর্থ প্রাচীন পর্বতমালা। উটকামণ্ডের 64 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত এই জঙ্গলটিকে 1934 সালে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। মুডুমালাই অভয়ারণ্যের আয়তন 322 বর্গ কিলো মিটার। মহীশূর এবং উটকামণ্ডের মধ্যে যে রাস্তাটি গেছে, তা মুডুমালাইকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এই জঙ্গলের উত্তরে বান্দিপুর ও পশ্চিমে কেরালার ওয়াইনাদ অভয়ারণ্য।

মেয়র নদী মুডুমালাইয়ের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে এবং পরে পুবে বাঁক নিয়ে বান্দিপুরের সঙ্গে মুডুমালাই-এর সীমারেখা টেনেছে।

মিশ্র পর্ণমোচী এই বনভূমি আয়তনে ছোট হলেও এখানে দেখা মেলে অসংখ্য পাখি আর বন্যপ্রাণীর।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে মুডুমালাই অভয়ারণ্যের প্রধান আকর্ষণ হাতি। বুনো হাতি আর গাউরের পাল বান্দিপুর আর মুডুমালাই-এর মধ্যে অবাধে যাতায়াত করে। যদিও বাঘের দর্শন এখানে সহজে মেলে না, তবুও বাঘের সংখ্যাও এখানে নেহাৎ কম নয়। কারগুদি এলাকায় প্রায়ই চিতাবাঘ চোখে পড়ে। এখানকার আরো গুরুত্বপূর্ণ শিকারি প্রাণী — ঢোল বা বনকুত্তা। 1964 সালে মহামারীর ফলে ভারতীয় গাউরের সংখ্যা এ জঙ্গলে বেশ হ্রাস পেয়েছে। আগে এখানে 70-80 গাউরের পাল প্রায়শই চোখে পড়ত, এখন সে দৃশ্য বিরল। তৃণভোজীদের মধ্যে আর আছে চিতল, কাকার এবং সম্বর। মাসিলগুদি অঞ্চলে শ'খানেক হরিণের পালও দেখা যায়। মাউস ডিয়ার-এর সন্ধান পাওয়া যায় এখানে। অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে মুডুমালাই-এ আছে বন শুয়োর, বনেট বাঁদর, উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি প্রভৃতি।

মেয়র পাওয়ার হাউসের আশেপাশের রাস্তায় গো-সাপের দেখা মেলে।

মুডুমালাই-এর জঙ্গলে নানান প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মালাবার ট্রোগন (Malabar Trogan)। তাছাড়া আছে মালাবার গ্রে হর্নবিল (Malabar Grey Hornbill), মালাবার গ্রেট ব্ল্যাক উড্‌পেকার (Malabar Great Black Wood-pecker), ক্রেস্টেড হক (Crested Hawk), সারপ্যান্ট ঈগল (Serpent Eagle), বসন্তবৌরী (Barbet) ও ময়না (Mayna) প্রভৃতি।

এ জঙ্গলে বণ্যপ্রাণী দেখবার শ্রেষ্ঠ সময় মার্চ থেকে জুন মাস।

এখানে জঙ্গলে ঘোরবার জন্যে হাতি ও জিপের সুবন্দোবস্ত আছে। মহীশূর থেকে উটীগামী যে কোন বাসে নেমে যাওয়া যায় মুডুমালাই-এর প্রবেশ দ্বারে।

থাকবার ও খাবার সুবন্দোবস্ত আছে এখানে।

আন্নামালাই অভয়ারণ্য

দারচিনি পাহাড়ের উত্তরপ্রান্তে, কোয়েম্বাটুর থেকে 65 কিলো মিটার দূরে 378 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে 1976 সালে ঘোষিত হয়েছিল আন্নামালাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।

আন্নামালাই মিশ্র পর্ণমোচী গাছের গভীর অরণ্য। এ জঙ্গলে দুরকম দামি গাছ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। এর মধ্যে একটি রোজউড আর অপরটি সেগুন।

এ জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ সিংহ-পুচ্ছ বাঁদর আর নীলগিরির হনুমান। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া শ্রীচালিপ্পাল্লাম নদীর তীরে ভারতীয় গাউর-এর বড় বড় দলের দেখা মেলে। এছাড়া এখানে চিতল, সম্বর, মাউস্ ডিয়ার, হাতি, কাকার হরিণের দেখা পাওয়া যায়। পাখির দিক থেকেও আন্নামালাই যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

জঙ্গলে ঘোরবার জন্যে এখানে হাতি ও জিপের বন্দোবস্ত আছে। সকালবিকেলে হাতি পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে।

থাকবার সু-বন্দোবস্ত আছে আন্নামালাই অভয়ারণ্যের ভেতরে। এখানে আছে পাঁচটি রেস্ট হাউস ও লগ হাট। যেখানে বিছানাপত্র ও খাবারদাবারের সু-বন্দোবস্ত আছে।

আন্নামালাই-এ যাবার শ্রেষ্ঠ মরসুম ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস।

এখানে থাকবার জন্যে নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে —

ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ারডেন, 5, রাউন্ড রোড, মহালিঙ্গপুরম, পোল্লাচি, কোয়েম্বাট্যুর, তামিলনাড়ু।

কালাকাদ অভয়ারণ্য

224 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে 1976 সালে ঘোষিত হয়েছিল কালাকাদ অভয়ারণ্য। এখান থেকে নিকটতম রেল স্টেশন তিরুনেভেলির দূরত্ব 40 কিলো মিটার। ত্রিবান্দ্রাম

থেকে রেল বা বাসে তিরুনেভেলি পৌঁছে, ওখান থেকে বাস বদলে কালাকাদ যাওয়া যায়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে বর্ষাকাল।

এখানে হাতি, বাঁদর প্রভৃতি বন্যপ্রাণী এবং অসংখ্য প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া যায়।

এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় জানুয়ারি থেকে মার্চ।

থাকবার জন্যে এখানে একটি রেস্ট হাউস আছে। অনুমতির জন্য নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হয় —

ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ারডেন, সেন্ট পিটার্স হল, তিরুনেভেলি, তামিলনাড়ু।

ভেদান্‌থাঙ্গাল অভয়ারণ্য

পাখিরালয় হিসাবে তামিলনাড়ুতে ভেদান্‌থাঙ্গালের জুড়ি নেই। মাদ্রাজ শহরের 80 কিলো মিটার দুরে অবস্থিত জলায় ভরা এই গ্রামটিতে শীতের অতিথি হয়ে আসে নানান যাযাবর হাঁসেরা। এদের মধ্যে সরাল, বেলেহাস, গিরিয়া হাঁস, টাফ্‌টেড ডাক (Tafted Duck) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বর্ষায় বাসা বাঁধে কয়েক প্রজাতির স্টর্ক আর হেরন। এখানকার আরেক গুরুত্বপূর্ণ বাসিন্দা গগনবেড়।

যদিও থাকবার জন্যে রেস্টহাউস আছে, তবে মাদ্রাজ শহর থেকে বাসে করে দিনে দিনে ঘুরে ফেরা যায়।

এখানে সবচেয়ে ভাল সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি।

অনুমতি নিতে নীচের ঠিকানায় লিখতে হবে —

ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্‌ডেন, 50, ফিফথ্‌ (Fifth) মেন রোড, গান্ধীনগর, মাদ্রাজ-২০।

ত্রিপুরা

সিপাহীজলা অভয়ারণ্য

ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে এটি অন্যতম। এ অভয়ারণ্যটির মধ্যে একটি সুন্দর চিড়িয়াখানা আছে। রয়েছে কৃত্রিম বন যার মধ্যে রবার বৃক্ষের বন অন্যতম। একটি সুন্দর ও মনোরম হ্রদ সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ফেরিস লীফ মাংকি বা চশমা বানরের স্বাভাবিক আবাস দেখতে হলে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে আসতেই হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে 20 কিলো মিটার দূরে এ অভয়ারণ্য। বছরের সব সময়েই এখানে আসা যায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে! ত্রিপুরা সরকার বাসে করে আগরতলা থেকে সিপাহীজলা ভ্রমণের ব্যবস্থা করে থাকেন। সিপাহীজলাতে বাসের জন্য বনবিভাগের তিন ঘরের একটি সুন্দর বাংলো রয়েছে— বুকিংয়ের জন্য ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্টস, ওয়াইল্ডলাইফ, আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পর্যটনের সুবিধার জন্য এখানে পায়ে চালান নৌকাবিহারের সুবন্দোবস্ত আছে। যে কোনও পর্যটক এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

তৃষ্ণা অভয়ারণ্য

ত্রিপুরা সরকার সম্প্রতি এ অভয়ারণ্যটিকে ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করেছেন— মোট আয়তন প্রায় 170 বর্গ কিলো মিটার। তৃষ্ণার প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখ চেয়ে দেখার মতো। এত গাছ-গাছালি, লতা-পাতার বৈচিত্র্য সহসা চোখে পড়ে না। তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বুনো হাতি, গাউর, বুনো শুয়োর, কাকার প্রভৃতির দেখা পাওয়া যাবে। পাখি প্রজাতির এক বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে এ অভয়ারণ্যে।

এখনও পর্যটকদের আকর্ষণ করার মত প্রচার বিশেষ গড়ে উঠেনি। অভয়ারণ্যে ঢোকার মুখে বনবিভাগের বাংলো রয়েছে। আরও একটি পর্যটন নিবাস করার প্রস্তাবও রয়েছে এখানে। অভয়ারণ্যের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন জলাশয় থাকায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যবস্থা এখানে অনেক সহজেই করা সম্ভব। নিকটবর্তী শহর উদয়পুর প্রায় 40 কিলো মিটার। নিকটবর্তী বিমানবন্দর আগরতলা প্রায় 120 কিলো মিটার।

নাগাল্যাণ্ড

ইন্‌টান্‌কি অভয়ারণ্য

নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 202 বর্গ কিলো মিটার সাব-ট্রপিকাল বন নিয়ে 1975 সালে ঘোষিত হয়েছে ইন্‌টান্‌কি অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্যের পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ধানসিঁড়ি নদী— যেটি অসম রাজ্যের সঙ্গে নাগাল্যাণ্ড রাজ্যেরও সীমানা নির্ধারণ করছে। এ অভয়ারণ্যটির সবচেয়ে উঁচু জায়গাটির উচ্চতা 677 মিটার ও এর অধিকাংশ অঞ্চলই অত্যন্ত নিচু। চার/পাঁচটি বন্য হাতির পাল এখানে ঘুরে বেড়ায়, যার মোট সংখ্যা প্রায় একশোর মতো। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1551 মিলি মিটার। হাতি ছাড়া এ অভয়ারণ্যের রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক (Sloth Bear), মিথুন, সম্বর, কাকার হরিণ (Barking deer), বুনো কুকুর (Dhole), উল্লুক (Hoolock) ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

পর্যটন ব্যবস্থা এবং উৎসাহী পর্যটকদের আকর্ষণ করার মত প্রচার এখনও ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। অভয়ারণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর বনবিভাগের বিশ্রামগৃহ রয়েছে। অভয়ারণ্য ভ্রমণ ও বিশ্রাম গৃহে রাত্রিবাস করার অনুমতির জন্য ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশন অফিসার নাগাল্যান্ড পো: ডিমাপুর, জিলা কোহিমা, নাগাল্যান্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যটনের পক্ষে উপযুক্ত। নিকটবর্তী শহর রেল ও বিমান বন্দর ডিমাপুর অভয়ারণ্য থেকে প্রায় 70 কিলো মিটার দূরে।

ফুলিবাজে অভয়ারণ্য

1979 সালে 9 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল ফুলিবাজে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এ অভয়ারণ্যটি ট্রাগোপান ও কালিজের জন্য বিখ্যাত। অবশ্য এখানে অন্যান্য বন্য প্রাণীরও দেখা পাওয়া যায়। এ অভয়ারণ্যে বনের চরিত্র হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ। এখানকার মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 2000 মিলি মিটার। এ অভয়ারণ্যে বাকিং ডিয়ার, মিথুন, বুনো শুয়োর, স্লথ ভাল্লুক, গোরাল প্রভৃতি বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যায়।

এখানে বিশেষ কোনও পর্যটন ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। অভয়ারণ্য ভ্রমণের অনুমতির জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন অফিসার, পো: ডিমাপুর, নাগাল্যান্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর কোহিমা মাত্র 2 কিলো মিটার দূরে ও নিকটবর্তী রেল ও বিমান বন্দর ডিমাপুর মাত্র 76 কিলো মিটার দূরে।

ফামিক অভয়ারণ্য

1983 সালে 6 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চলকে ফামিক অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নাগা হিলের এই নাতিশীতোষ্ণ অভয়ারণ্যের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় 2000 মিলি মিটার। এ অভয়ারণ্যে বাঘ, জংলি বিড়াল, সম্বর, কাকার, বুনো শুয়োর, উল্লুক, মিথুন ও ট্রাগোপান (Tragopan) ও অন্যান্য পাখি প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। এ অভয়ারণ্যটির সর্বোচ্চ স্থান প্রায় 3000 মিটার উচ্চতায়।

বিশেষ পর্যটন ব্যবস্থা এখনও ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যটনের পক্ষে উপযুক্ত সময়। অভয়ারণ্যে দেখার অনুমতির জন্য ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশন অফিসার, পো: ডিমাপুর, জিলা কোহিমার সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। নিকটবর্তী রেল ও বিমানন্দর ডিমাপুর 388 কিলো মিটার দূরে।

পশ্চিমবঙ্গ

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সমুদ্র সন্নিহিত বনভূমি সুন্দরবন— যেখানে গড়ে উঠেছে এই জাতীয় উদ্যান। এককালে সুন্দরবনের বনভূমির আয়তন ছিল দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার যার অর্ধেকেরও বেশি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বসতি ও আবাদে পরিণত হয়। 1973 সালে ভারতের জাতীয় প্রাণী বাঘ ও তার আবাসভূমি উপকূলবর্তী অরণ্য সংরক্ষণের জন্য মোট 2,585 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা তৈরি হয়। এর মধ্যে অন্তঃস্থল (কোর এলাকা) প্রায় 1,330 বর্গ কিলো মিটার— যেটি 1984 সালে জাতীয় উদ্যানরূপে বিজ্ঞাপিত হয়। জাতীয় উদ্যানটি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন। এর সদর কার্যালয় বর্তমানে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ক্যানিং-এ অবস্থিত।

অসংখ্য গভীর লবণাক্ত নদী-নালা-খাঁড়ি সুন্দরবনকে বিচিত্র সাজে সাজিয়েছে। অঞ্চলটির শতকরা প্রায় 65 ভাগ বনাঞ্চল এবং বাকি প্রায় 35 ভাগ জল। এই সব নদী-নালাগুলি অনেক সমতল দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এগুলি জোয়ারে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়। বর্তমানে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত বড় বড় নদীগুলি গঙ্গার প্রাচীন ধারার

সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভের জঙ্গলে একটি বৈশিষ্ট্য — ঠেসমূল

অবশিষ্টাংশ। সমুদ্রের জলস্রোতের তীব্র ভিন্নমুখী গতির ফলে জল সারা বছরই প্রচণ্ড লবণাক্ত থাকে।

সুন্দরবন ক্রান্তীয় আর্দ্র উপকূলবর্তী অরণ্য (ম্যানগ্রোভ) প্রধানত জোয়ারের লবণাক্ত জলদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ধরনের জলাভূমি শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে গেঁওয়া, বাইন, গরান, কেওড়া, কাঁকড়া, পশুড়, হেতাল, গোলপাতা, ধুন্দল, সুন্দরী প্রভৃতি। এখানকার বনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অধিকাংশ গাছের বীজ বৃক্ষেই অঙ্কুরিত হয়। আর শিকড় থেকে অসংখ্য সূক্ষ্মাগ্র গ্রন্থী মাটি ফুড়ে তীরের মতো বের হয়— যার প্রচলিত নাম শূলো যা আসলে শ্বাসমূল। এ বনে বৃক্ষজাতির বৈচিত্র্য খুব একটা বেশি হয় না— কিন্তু অসংখ্য বৃক্ষরাজির ঘন সমাবেশ এ বনের বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে।

সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী, বিশ্বের বন্যপ্রাণী মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছোট আকারের (সুমাত্রার) গণ্ডার ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনস্মৃতিতে আছে যে তখন প্রজারা জমিদারের কাছে গণ্ডারের মাংস ভেট আনত। 1870 সালে সুমাত্রার গণ্ডার, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারশিঙ্গা, 1885 সাল থেকে 1900 সালের মধ্যে বুনো মোষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাকার হরিণ সুন্দরবন থেকে লোপ পেয়েছে। বর্তমানে এখানে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লোনাজলের কুমীর এবং অবিশ্বাস্য ধূর্ত ও রোমাঞ্চকর বাঘ পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের বনাঞ্চলের এককভাবে যে কোনও বনভূমির চেয়ে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যাই বেশি। অন্যান্যদের মধ্যে চিতল হরিণ, বন্য-বরাহ, বানর, মাছধরা বিড়াল, বন-বিড়াল প্রভৃতি এখানে রয়েছে। দূর থেকে দেখতে খুব মজা লাগে চিতল হরিণ আর বানরের সহাবস্থান— যখন চিতল হরিণের দল বানরের পেছন পেছন কেওড়ার এক উপবন থেকে আর এক উপবনে যায়। আর বানররা খেতে খেতে গাছের ওপর থেকে যা ফেলে দেয়, তাই তুলে খায়। বাঘের উপস্থিতি ঘটার আগেই বানররা তা ঘোষণা করে। সত্যিই সহাবস্থানের এ এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত! বালুচরে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় অদ্ভুত সুন্দর ও নানারঙের ফিডলার কাঁকড়া ও অসিপড়া কাঁকড়া। অতিকায় কচ্ছপ ও রং-বেরঙের গোসাপ। রায়মঙ্গল ও ঝিলা নদীতে প্রায়ই শুশুক দেখা যায়।

মৎস জগতে সুন্দরবনের স্থান অদ্বিতীয়। এখানের জলে হাঙরও দেখা যায়।

প্রতি বছর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত এখানকার বিরাট বিরাট প্রাকৃতিক মৌচাক থেকে মধু আহরণ করে স্থানীয় জনগণ ও সরকারের বেশ আয় হয়। বহু পাখির আবাসস্থল এই সুন্দরবন। এর মধ্যে বড় গুলিন্দা, ছোট বাটান বা স্বর্ণাভ বাটান, বড়দীঘর, গাংচিল, সিন্ধুচিল প্রভৃতি উল্লেখ্য।

সুন্দরবনের অনাবিল সৌন্দর্য ভ্রমণকারীদের মনে এক উত্তেজনাপূর্ণ উজ্জ্বল ও আনন্দঘন মুহূর্ত নিয়ে আসে। যতদূর দৃষ্টি যায় লবণাক্ত নীল বিশাল জলরাশি, অন্তর্ভাগে অশান্ত বিভিন্নমুখী স্রোতের নৃত্য। সবুজে জড়ানো অন্ধকারে ও পলিমাটির আস্তরণে

ঢাকা শান্ত সৌম্য বন-ভূমির সঙ্গে বাঘ, কুমীর এবং অন্যান্য প্রাণী ও মৎস্য গোষ্ঠী মিলে এক অদ্ভুত গা ছমছম করা অথচ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সরীসৃপের লীলাক্ষেত্র সুন্দরবনের সঙ্গে বহির্জগতের সড়কপথে কোনওই যোগাযোগ নেই। ক্যানিং বন্দর, হাসনাবাদ, সোনাখালি, রায়দিঘি, বাসন্তী, নেজাত, ধামাখালি প্রভৃতি স্থানে মোটর বা বাস যোগে পৌঁছে জলযানে এই বনাঞ্চলটি ভ্রমণ করা যায়। নিকটস্থ বিমান-বন্দর দমদম। ট্রেন যোগেও শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং $1\frac{1}{2}$ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছানো যায় — দূরত্ব প্রায় 50 কিলো মিটার।

সজনেখালি ও দয়াপুরে পর্যটকদের জন্য থাকবার বন্দোবস্ত রয়েছে। বন্যপ্রাণীকে চোখে দেখে উপভোগ করার জন্য সজনেখালিতে নজর মিনার (Watch Tower) আছে। এ ছাড়াও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলের হলদি, সুধন্যখালি, নেতিধোপানি, গাববেনিয়া প্রভৃতি স্থানে মিষ্টি জলের পুকুরের নজর মিনারের সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে জঙ্গল পিয়াসী পর্যটকদের কাছে টানবার কথা ভেবেই।

লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় সপ্তমুখী ব্লকের 1-নম্বর বনখণ্ডে লোথিয়ান দ্বীপটি অবস্থিত। এর নিয়ন্ত্রণ ভার রয়েছে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, 24 পরগনার ডিভিশনের উপরে। অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন প্রায় 38 বর্গ কিলো মিটার। 1948 সালে প্রথম অভয়ারণ্যরূপে বিজ্ঞাপিত হয় এবং 1976 সালে পুনরায় সরকারিভাবে ঘোষিত হয়। অভয়ারণ্যটি সুন্দরবন ব-দ্বীপের একটি অংশবিশেষ। জোয়ারের প্লাবন, ঘূর্ণি-ঝড়, অসংখ্য খাড়ি ও নালা এই দ্বীপের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অভয়ারণ্যটি ক্রান্তীয় আর্দ্র উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অন্তর্গত। এখানকার বিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে কেওড়া, বায়েন, গরান প্রভৃতি প্রধান। নদীর ধারে ধারে কিছু কিছু ধানি ঘাসের বিস্তারও রয়েছে এ অভয়ারণ্যের মধ্যে।

লোথিয়ান দ্বীপের বন্যপ্রাণী বাসিন্দাদের মধ্যে চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর ও বানর উল্লেখযোগ্য। কখনও কখনও এখানে বনবিড়ালের দেখাও পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির সমাবেশও এ অভয়ারণ্যে লক্ষণীয় — বিশেষত শীতকালের যাযাবর পাখি। এই জলা-জঙ্গলের দ্বীপের আর এক বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে বিরল শ্রেণীর নোনাজলের সামুদ্রিক কুমীর।

পর্যটনের সুবিধার জন্য অভয়ারণ্যের মধ্যে রয়েছে দৃষ্টি-নন্দন ওয়াচ টাওয়ার। লোথিয়ান দ্বীপে যেতে হলে কোলকাতা থেকে নামখানা পৌঁছে কোনও জলযানে করে যেতে হয়। মোটর লঞ্চে ঘন্টা তিনেকের রাস্তা। নামখানায় বিশ্রামাগার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। পি. ডব্লু. ডি. বিভাগের বিশ্রামাগার রয়েছে নামখানায়।

সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারাণ্য

সুন্দরবনের সজনেখালি নামক স্থানে অবস্থিত এ অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন প্রায় 362 বর্গ কিলো মিটার। 1960 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলটিকে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। 1976 সালে এটি আবার সরকারিভাবে পুনর্ঘোষিত হয়। এই অভয়ারণ্যটির নিয়ন্ত্রণভার রয়েছে ফিল্ড ডাইরেক্টর, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপরে। এটি ক্রান্তীয় আর্দ্র উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ অরণ্যাঞ্চলের অন্তর্গত।

সজনেখালি অভয়ারণ্যটি পাখির আশ্রয়স্থল হিসাবে বিখ্যাত। বর্ষাকালে (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) প্রচুর পাখি এই বনাঞ্চলের সুন্দরী, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি গাছে বাসা বাঁধে— ডিমপাড়ে ও বাচ্চা বড় করে তবেই এস্থান ত্যাগ করে পাখি প্রজাতিরা। মুখ্যত শামুকখোল, পানকৌড়ি, বক ও নাইট হেরন পাখিরাই বাসা বাঁধে। কিন্তু এছাড়া শঙ্খচিল, সরাল, টিট্টিভ, বাটাম, বাজ্কা প্রভৃতি পাখি প্রজাতির কলতানে মুখরিত সজনেখালি পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। পাখি ছাড়া এই বনে বুনোশুয়োর, চিতল হরিণ, গোসাপ ও নোনাজলের কুমীর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে সুন্দরবনের বাঘ।

কলকাতা থেকে ক্যানিং রেলপথে 46 কিলো মিটার। সেখান থেকে জলযানে গোসাবা ঘুরে সজনেখালি আসতে হলে আরও 50 কিলো মিটার অতিক্রম করতে হবে। আবার কলকাতা থেকে সরাসরি বাস বা মোটরযানে সোনাখালি ও তারপরে জলযানে বাসন্তী, গোসাবা হয়ে সজনেখালি যাওয়া যায়।

এই অভয়ারণ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর 60 শয্যা-বিশিষ্ট একটি পর্যটন আবাস তৈরি করেছেন যাতে ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের এই সুন্দর জায়গায় থাকবার অসুবিধা দূর করা যায়। এই অভয়ারণ্যের মধ্যে দুটো মিষ্টি জলের পুকুর ও তিনটি সুউচ্চ নজর মিনারের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে সেখানে থেকে বন্যপ্রাণী চাক্ষুস দেখার আনন্দ পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন।

ভগবতপুর কুমীর প্রকল্প

সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এ অঞ্চলের কুমীর— যার বৈজ্ঞানিক নাম ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস। আমেরিকার ফ্লোরিডায় সাইপ্রাস সংরক্ষিত জলাভূমিতে যেমন এলিগেটর কুমীর, সুন্দরবনের নোনাজলের কুমীরও তেমনি পৃথিবী বিখ্যাত। সুন্দরবন অঞ্চলের খাঁড়িগুলি এই কুমীরের পক্ষে প্রকৃষ্ট। বহুপূর্বে উপকূলবর্তী এই জলাভূমিতে এদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু মূল্যবান চামড়া ও অন্যান্য কারণে এ কুমীর প্রজাতিকে নির্মমভাবে হত্যা করে মানুষ। তাই পরবর্তীকালে মানুষকেই তার কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কুমীর প্রকল্প তৈরির মধ্য দিয়ে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল—

সুন্দরবনের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ও এ জন্য কুমীর প্রজাতির বংশ বৃদ্ধি ও পরবর্তীকালে বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা। ভগবতপুর কুমীর প্রকল্পটি এইরূপ চিন্তাধারারই ফসল।

প্রকল্পটি 1976 সালে চালু করা হয়। কলকাতা থেকে সড়ক পথে 105 কিলো মিটার নামখানার দূরত্ব এবং নামখানা থেকে জলপথে ভগবতপুর আরও 29 কিলো মিটার। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কুমীরের ডিম সংগ্রহ করে সেগুলি ভগবতপুরের কুমীর প্রকল্প এলাকায় নিয়ে এসে কৃত্রিম উপায়ে ফোটানো হয়। এই উদ্দেশে এখানে জলাধার নির্দিষ্ট করা আছে। কুমীর বাচ্চা ডিম ফুটে বেরোলে তাকে আলাদা একটি জলাধারে রাখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুন্দরবনের কুমীরের বাচ্চা জন্মের ঠিক পরেই বিবিধ খাদ্যসামগ্রী গোগ্রাসে খেতে শুরু করে। বাচ্চারা 1 মিটার লম্বা হলে তাদের সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষামূলকভাবে অলিভ রিডলে কচ্ছপের জন্যেও অনুরূপ একটি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

1980 সালে পারমাদন অভয়ারণ্য হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়— মোট আয়তন প্রায় 64 হেক্টর। 1985 সালে এই অভয়ারণ্যটির নতুন নাম দেওয়া হয় বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। উত্তর 24 পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইছামতী নদীর উঁচুপাড়ে এই অভয়ারণ্যটি অবস্থিত। ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে এই অভয়ারণ্য।

বিগত পঞ্চাশের দশকে এই অঞ্চলে বৃক্ষাদি রোপণের কাজ শুরু হয়েছে। এখানে শিশু, মিন্‌জিরি, অর্জুন, শিমূল, শিরিষ, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষের সমাবেশ ঘটেছে।

এ অভয়ারণ্য তৈরির শুরুতে 8 টি চিতল হরিণ আনা হয়। 1965 সালে 3টি নবজাতক সহ 15টি চিতল হরিণ সেখানে ছিল। 1966 সালে আরও 26 টি চিতল হরিণ এখানে ছাড়া হয়। ধীরে ধীরে হরিণরা তাদের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। বর্তমানে (1986 সালের সুমারি অনুসারে) এ অভয়ারণ্যে 201 টি চিতল হরিণ রয়েছে। এখানে নলকূপের সাহায্যে জলাধারগুলিকে পরিপূর্ণ রাখা হয়। এসব জলাধার চিতল হরিণের পানীয় জলের চাহিদা মেটায়। এখানে বিভিন্ন প্রকার পাখি নিয়ে একটি সুন্দর পাখিরালয়ও আছে। এছাড়াও এখানে সচরাচর শামুখখোল, শঙ্খচিল, ডাহুক, লাল তিতির, হরিয়াল, বিভিন্ন প্রজাতির ঘুঘু, টিয়া, ফুলটুসি, পাপিয়া, কোকিল, খুদে পেঁচা, রাতচরা, মাছরাঙ্গা, নীলকণ্ঠ, বসন্তবৌরী, কাঠঠোকরা, বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে, হাঁড়িচাঁচা, বুলবুল, ছাতারে, দোয়েল, শ্যামা, বাবুই প্রভৃতি অসংখ্য পাখির এক অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ করা যায়।

কলকাতা থেকে পারমদনের দূরত্ব প্রায় 110 কিলো মিটার। বনগাঁ থেকে দত্ত ফুলিয়ার পথে নলডুরিং ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হয়। শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ পর্যন্ত রেলযোগেও যাওয়া যায়। পর্যটনের সুবিধার জন্য অভয়ারণ্যের ভেতরে বন বিশ্রাম গৃহ রয়েছে যার রিজার্ভেশনের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বনভূমি, পো কৃষ্ণনগর, জিলা নদীয়া-কে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী অভয়ারাণ্য

1941 সালে এই অরণ্য সংরক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বর্তমানে একে অভয়ারণ্য হিসেবে সরকারিভাবে পুনরায় ঘোষিত করেছে। 1976 সালে মোট আয়তন প্রায় 116 বর্গ কিলো মিটার ছিল। এই বনাঞ্চলটির গঠন একটু অদ্ভুত ধরনের— অনেকটা পায়জামার মতো। এটি হিমালয়ের পাদদেশ থেকেই উদ্ভুত বলা চলে। অভয়ারণ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি বড় নদী— তোরসার এবং মালঙ্গী। তোরসার পূর্বেকার জলধারা শুকিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে প্রধান নদী হল মালঙ্গী। সমগ্র বনাঞ্চলটি শুকনো ঝরণা ও পরিত্যক্ত নদীর সমাহার।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের বনাঞ্চলে প্রকৃতির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এখানে গাছাপালা ছাড়া বনভূমি যেমন আছে তেমনি কাছে নদীভিত্তিক বনভূমিও আছে। শুষ্ক মিশ্র, আর্দ্র মিশ্র ও শাল বনের প্রাচুর্য অভয়ারণ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নদীর মাঝের চরে ঘন ঘাসের বন রয়েছে। শিশু, খয়ের, শিরিষের সঙ্গে রয়েছে ছাতিম, পিটালি, জাম প্রভৃতি গাছ।

বন্যপ্রাণী সম্পদে ভরপুর এই জলদাপাড়া বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য। একশৃঙ্গী গণ্ডার ছাড়া এখানে দেখা যায় বাঘ, গাউর, চিতাবাঘ, সম্বর, হাতি, পাড়া হরিণ, কাকার হরিণ, চিতল হরিণ, সম্বর, শ্লথ ভাল্লুক ও প্রায় বিলুপ্ত বেঙ্গল ফ্লোরিকান। 1988 সালের বন্যপ্রাণী সুমারী অনুযায়ী এখানে 7 টি বাঘ, 16 টি লেপার্ড, 32 টি একশৃঙ্গী গণ্ডার আছে।

সরীসৃপের মধ্যে জলদাপাড়ায় ময়াল বা অজগর, কেউটে প্রভৃতি দেখা যায়, গো-সাপও দেখা যায়। পাখির বিভিন্ন-জাতি ও প্রজাতি রয়েছে এ অভয়ারণ্যে। নদীর জলের মাছগুলির মধ্যে মহাশোলও এখানে পাওয়া যায়। এ বনভূমিতে 12 টি স্থানে কৃত্রিম নুন মাটির ব্যবস্থা আছে। এই নুন মাটির মাঠগুলি বন্যপ্রাণীদের কাছে খুবই প্রিয়। নুন মাটির আস্বাদ নিতে এরা প্রায়ই এখানে আসে। তাই এসব জায়গায় গাছে উপরে তৈরি মাচা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সহজেই দেখা যায়।

ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, বন্যপ্রাণী ডিভিশন— 2; জলপাইগুড়ি জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। মোটরে, ট্রেনে বা সহজেই জলদাপাড়া পৌঁছানো যায়। অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর মাদারীহাটের দূরত্ব মাত্র 6 কিলো মিটার।

মাদারী হাটে মিটার গেজের একটি রেল স্টেশনও আছে। 31 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই অভয়ারণ্যটির অবস্থিতি— শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে 150 কিলো মিটার। ব্রডগেজ রেল স্টেশন ফালাকাটা অভয়ারণ্যের দক্ষিণে 16 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত। নিকটবর্তী বিমান বন্দর বাগডোগরা। পর্যটন দপ্তর জলদাপাড়ায় তিনটি ট্যুরিস্ট লজ স্থাপন করেছেন— হলং, মাদারীহাট ও বরদাবরি। অভয়ারণ্যের কাছেই বন বিভাগের তিনটি বাংলো রয়েছে মাদারীহাট, নীলপাড়া ও কোদাল বস্তিতে। এই সব বন বিভাগের বাংলোর বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, কোচবিহার ডিভিশন, পো: ও জিলা: কোচবিহার-এর সঙ্গে। লজের সামনেই পোষা হাতি শুঁড় তুলে অভিবাদন জানাবে ও নিয়ে যাবে অরণ্য অভিযানে। বনবিভাগ থেকেই এই সব হাতি ভাড়া দেওয়া হয়। অভয়ারণ্য দেখার সবচেয়ে ভাল সময় নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস।

রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

রায়গঞ্জ প্রথমে একটি পাখিরালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি তত্ত্বাবধান করেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ডিভিশন। এই অঞ্চলটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয় 1985 সালে। অভয়ারণ্যের ব্যাপ্তি 1.3 বর্গ কিলো মিটার।

বনাঞ্চলটি 1960 সালের বনসৃজনের অংশ বিশেষ। কদম, জারুল, শিশু, সেগুন, খয়ের প্রভৃতি গাছ অভয়ারণ্যের উঁচু জায়গাটিকে অরণ্যের রূপ দিয়েছে। এর নীচের দিকে রয়েছে ঘন উলু ও কাশবন।

অভয়ারণ্য সৃষ্টির ফলে স্থানীয় কিছু প্রাণী যথা শিয়াল, খেঁকশিয়াল, খরগোস, বনবিড়াল প্রভৃতি আশ্রয় পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রকমের মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্রতি বছর জুন মাস থেকে সমস্ত অভয়ারণ্যটি যাযাবর পাখিতে ভরে যায়। শামুকখোল, বক, পানকৌড়ি, বাজ্কা প্রভৃতি পাখিদের দেখা যায়। এরা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা বড় করে এবং বর্ষা শেষে চলে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আছে, ঘুঘু, চিল, পেঁচা, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, ফিঙ্গে প্রভৃতি। পাখিদের খাদ্যেরও অভাব নেই এখানে। পুঁটি, গুগলি, জলার পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, কেঁচো এসব কিছুর উপর নির্ভর করে ওই পাখিদের বিরাট জমজমাট সংসার। বর্তমানে জলাভূমিটি লতা-গুল্মে, গাছ গাছড়ায় ঢাকা পড়ে যাওয়ায় পশু পাখিদের কাছে এখন এটি একটি সুন্দর ভয়মুক্ত পরিবেশ। কুলিক নদী আর তার জলাভূমি প্রকৃতি পরিচয়ের আদর্শ স্থান।

শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক ধরে চোপড়া কিষাণগঞ্জ ডালখোলা পেরিয়ে এলে কুলিক নামে একটি ছোট নদী পড়বে। কুলিক আর তার আশপাশ ঘিরে যে জলা জায়গা

রয়েছে সেখানেই আজ রায়গঞ্জ অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে। 34 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারের রায়গঞ্জ শহর ওই অভয়ারণ্য থেকে মাত্র 3 কিলো মিটার দূরে। কাছেই একটি পর্যটন নিবাস রয়েছে। এছাড়া অভয়ারণ্য সংলগ্ন বনবিভাগের বাংলো রয়েছে— যার বুকিং-এর জন্য — ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ডিভিশন। পো: ও জিলা: মালদহ-কে লিখতে হবে বা যোগাযোগ করতে হবে।

বেথুয়াডহরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

1958-59 সালে বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যের বনভূমিটি তৈরি করার কাজ শুরু হয়। প্রথমে এটি ছিল একটি মৃগদাব অর্থাৎ ডিয়ার পার্ক। 1980 সালে সরকারিভাবে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয়— মোট আয়তন প্রায় 1.21 বর্গ কিলো মিটার।

বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য মৌসুমী শাল বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সমগ্র বনাঞ্চলটি একটি উঁচু তারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষিত। মৃগদাবটি সমতল এবং কাছেই রয়েছে নিচু জলাভূমি। এখানে সেগুন, অর্জুন, শিশু, গামার, শিরিষ, মিঞ্জিরি, বাঁশ প্রভৃতি গাছ আছে। এছাড়া হরিণের খাদ্যোপযোগী বেশ কিছু ফল ও পাতার গাছও রোপণ করা হয়েছে।

বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে 1969 সাল নাগাদ প্রথম চিতল হরিণ ছাড়া হয়। একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি শিশু চিতল হরিণ নিয়ে এই মৃগদাব শুরু হয়। এর পর আরও একটি কাকার হরিণ স্থান পায় এখানে। বর্তমানে এই অভয়ারণ্যে চিতল হরিণদের সংখ্যা একসঙ্গে অনেক দেখতে পাবার সুযোগ পর্যটকদের এই অভয়ারণ্যটির সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। এখানে কয়েকটি স্থানে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ওই উপবনে সুন্দর ও গভীর জলাশয় রয়েছে সেখানে হরিণেরা সারা বছর পানীয় জল পায়। হরিণ ছাড়া এই অভয়ারণ্যে সাপ, সজারু, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীও রয়েছে। বেশ কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা পাওয়া যায়।

34 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই বেথুয়াডহরি। বেথুয়াডহরি রেলস্টেশন থেকে 2 কিলো মিটার দূরে এই অভয়ারণ্যটি অবস্থিত। কৃষ্ণনগর শহর থেকে অভয়ারণ্যটির দূরত্ব প্রায় 22 কিলো মিটার। অভয়ারণ্যের মধ্যেই বনবিভাগের একটি সুন্দর বাংলো রয়েছে। এর বুকিংয়ের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, নদীয়া মুর্শিদাবাদ ডিভিশন, পো: কৃষ্ণনগর, জিলা: নদীয়া-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। এছাড়া অভয়ারণ্যের ঠিক পাশেই রয়েছে পর্যটন দপ্তরের বিশেষ সুযোগ সুবিধাসহ দিবস যাপন কেন্দ্র।

রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

এ অভয়ারণ্যটি কার্যত একটি মৃগদাব। বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ও ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, বর্ধমান বনভূমির অধীনে রয়েছে। মোট আয়তন প্রায় 14 হেক্টর। 1981

সালের সেপ্টেম্বর মাসে রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়। সেগুন ও শালের আবাদী বন ও কদবেল, ডুমুর, জাম প্রভৃতি গাছ নিয়ে এ অভয়ারণ্যটি গড়ে উঠেছে।

1978 সালে এই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জন্য চিতল ও কাকার হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে (1988 সালের গণনা অনুযায়ী) এই অভয়ারণ্যে 27 টি চিতল, 8 টি কাকার ও 1 টি কৃষ্ণসার রয়েছে।

নগর জীবনের কোলাহল থেকে দূরে স্বাভাবিক বন্য পরিবেশে সংরক্ষিত হরিণদের স্বচক্ষে দেখার সুযোগ উপভোগের জন্য রমনাবাগান পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে। বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে রেলস্টেশন থেকে মাত্র 1 কিলো মিটার দূরে এ অভয়ারণ্যটি অবস্থিত বলে পর্যটকরা অনায়াসেই এ অভয়ারণ্য দেখার সুযোগ পেতে পারেন।

হলিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী জাতীয় উদ্যান

বঙ্গোপসাগরের কাছে মাতলা নদীর মুখে প্রায় 6 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল জুড়ে হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি। বনভূমিটি দুলিভাসানি ব্লকের 7 নম্বর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এটি অভয়ারণ্য হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয় 1976 সালে। অভয়ারণ্যটি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, 24 পরগণা ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে।

এই বনভূমিটি ক্রান্তীয় আর্দ্র উপকূলবর্তী অরণ্য (ম্যানগ্রোভ) অঞ্চলে পড়েছে। দ্বীপটি সুন্দরবন ব-দ্বীপের একটি অংশ বিশেষ। এখানে ক্রান্তীয় নোনা জলাভূমির বৃক্ষ প্রজাতি যথা কেওড়া, বাইন, গরান প্রভৃতির সঙ্গে মিষ্টি জলের গাছ যথা ঝাউ, করঞ্জ প্রভৃতিরও দেখা পাওয়া যায়।

বণ্যপ্রাণী প্রজাতির মধ্যে চিতল, হরিণ, বুনো শুয়োর, বানর প্রভৃতি রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সুন্দরবনের বাঘ ও নোনা জলের কুমীর প্রজাতি।

জলপথে রায়দীঘি থেকে এ অভয়ারণ্যের দূরত্ব প্রায় 50 কিলো মিটার। রেল ও সড়কপথে রায়দীঘির সঙ্গে কলকাতা, ডায়মণ্ডহারবার ও বারুইপুরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

চাপরামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

1940-41 থেকে এটি একটি প্রাণী সংরক্ষিত কেন্দ্র হিসাবে ঘোষিত হয়। পরবর্তীকালে 1976 সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই অভয়ারণ্যের মোট আয়তন প্রায় 9.60 বর্গ কিলো মিটার। মূর্তি নদী এই অভয়ারণ্যের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে।

প্রাথমিককভাবে এ অভয়ারণ্যের বনাঞ্চলকে শুষ্ক মিশ্র জাতির বন বলা যেতে পারে। তবে এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমিশ্র ও পরিণত শালের বনও আছে। প্রাচুর্যপূর্ণ প্রধান বৃক্ষ

প্রজাতিগুলি হল— লালি, চিলৌনী, কাঞ্চন, বহেড়া, পারারী, কাওলা, সিন্দুরে টাটারী প্রভৃতি।

বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যেও এই অভয়ারণ্য বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। হাতি, গাউর, বুনো শুয়োর, সম্বর, কাকার হরিণ, চিতাবাঘ ও বাঘ প্রভৃতি দেখা যায় এ অভয়ারণ্যে। এছাড়া বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতির পাখিদের কল-কাকলিতে মুখরিত হয় এই অভয়ারণ্য।

31 নম্বর জাতীয় সড়ক চাপরামারি অভয়ারণ্যের পাশ দিয়ে চলে গেছে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাপরামারি মাত্র 2 কিলো মিটার দূরে। এই অভয়ারণ্যের চৌহদ্দীতেই বন বিভাগের একটি সুন্দর বাংলো আছে— যার বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার জলপাইগুড়ি ডিভিশনের সঙ্গে।

গরুমারা বন্যপ্রাণী জাতীয় উদ্যান

গরুমারা অভয়ারণ্যটি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। 1942 সালে প্রাণী সংরক্ষিত কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত অরণ্যটি 1949 সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যর মর্যাদা পায়। 1976 সালের জুন মাসে এটি আবার সরকারিভাবে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে পুনরায় ঘোষিত হয়। অভয়ারণ্যর মোট আয়তন প্রায 8.62 বর্গ কিলো মিটার। অভয়ারণ্যর বেশির ভাগ অঞ্চলই মূর্তি ও জলঢাকা নদীর নিচু প্লাবনভূমি, এখন গরুমারা জাতীয় উদ্যান।

বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতির সমারোহে এ অভয়ারণ্যটি বেশ সমৃদ্ধ। উঁচু বনভূমিতে শালের সঙ্গে চিলৌনী, বহেড়া, জিওন, ওদাল, জাম, চিকরাসী, কাটুস, সিধা প্রভৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু নিচু এলাকায় রয়েছে নদীভিত্তিক বন— যার মুখ্য প্রজাতি হচ্ছে শিমুল, শিরিষ ও খয়ের। এখানে বিরাট এলাকা জুড়ে আছে তৃণভূমি। ঘাসের মধ্যে উলুঘাস, নলখাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গরুমারা অভয়ারণ্যের প্রধান আকর্ষণ একশৃঙ্গী গণ্ডার যা সারা পশ্চিমবঙ্গে জলদাপাড়া ছাড়া একমাত্র এখানেই টিকে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মালদা জেলায় 1876 সাল পর্যন্ত একশৃঙ্গী গণ্ডার দেখা যেত বলে জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই প্রজাতিটি জলপাইগুড়ি জেলার দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। প্রধানত একশৃঙ্গী গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য গরুমারা বিখ্যাত হলেও অন্যান্য মাংসাশী ও তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর অভাব নেই। হাতি,গাউর, বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো শুয়োর, সম্বর, কাকার হরিণ প্রভৃতি সাধারণত এখানে দেখা যায়। শীতকালে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির মেলা পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালিজাং আর ধনেশ এবং ছোট পাখির মধ্যে কলার বুশ চ্যাট (Collared Bush Chat), ন্যাস ওয়ারবলার (Nash Warbler), মেরুণ ওরিওল (Maroon Oriole)-এর দেখা পাওয়া যায়।

গরুমারা অভয়ারণ্য থেকে চালসা ও লাটাগুড়ি শহরের দূরত্ব মাত্র 12 কিলো মিটার। 31 নম্বর জাতীয় সড়ক অভয়ারণ্যের দক্ষিণ দিক ঘিরে আছে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাল জংশন ও চালসা। মালে একটি পর্যটন নিবাস রয়েছে। এছাড়া অভয়ারণ্যের মধ্যে বনবিভাগের একটি সুন্দর বিশ্রামাগার যেখানে পর্যটকরা রাত কাটাতে পারেন। বন্যপ্রাণী দেখার জন্য বাংলোর সঙ্গেই রয়েছে নজরমিনার ও লবণের ঢিপি। গরুমারার বন বিশ্রামাগার বুকিংয়ের জন্য — ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, জলপাইগুড়ি, পোঃ ও জিলা জলপাইগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যান

1986 সালে প্রায় 79 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল ঘিরে সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যান সরকারিভাবে ঘোষিত হয়। পূর্ব হিমালয়ের কোলে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সীমান্তে এই জাতীয় উদ্যানের অবস্থিতি। এই জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন গাছপালা ও বন্যপ্রাণী, পাহাড়ের দৃশ্য পর্যটকদের কাছে এক বিরাট আকর্ষণ।

জাতীয় উদ্যানটি, দক্ষিণ রিমবিক, সন্দকফু, শিরি এবং ফালুটের বন নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানকার উচ্চতা প্রায় 2,300 মিটার থেকে 3,650 মিটার। তবে বেশির ভাগ অঞ্চলই 2,440 মিটার উচ্চতার ঊর্ধ্বে। বাৎসরিক উষ্ণতা গ্রীষ্মে 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ও শীতককালে 0 ডিগ্রি থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। মে থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সন্দকফু ও রামাম-এ যথাক্রমে 3,300 মিলি মিটার ও 3,150 মিলি মিটার। 3,300 মিটারের চেয়ে উঁচুতে শীতকালে বরফ পড়ে। ছোট রঙ্গিত এবং রামাম প্রধান নদী, আর রয়েছে শিরিখোলা, লোধামা খোলা। এছাড়া সিং প্রতাপ খোলা ও রিখুখোলা যথাক্রমে ফুলুট ও কালিপোখরি থেকে সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত রামাম নদীতে মিশেছে।

সবুজের আশ্চর্যরকম বৈচিত্র্য রয়েছে এ জাতীয় উদ্যানে। ওক, হেমলক, রূপালি দেওদার, রূপালি ফার জাতীয় গাছ, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ এ জাতীয় উদ্যানকে সমৃদ্ধ করেছে। আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বন এ জাতীয় উদ্যানের বৈশিষ্ট্য। রোডোডেনড্রনে ও জুনিপারের বিভিন্ন প্রজাতির রঙবেরঙের ফুলের বাহার পর্যটকদের আকৃষ্ট করবেই।

প্রায় 80 থেকে 90 টি স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় এই জাতীয় উদ্যানে। এর মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, চিতা বিড়াল, সোনালী বিড়াল (গোল্ডেন ক্যাট) বনবিড়াল, বিরল শ্রেণী ভুক্ত লাল পাণ্ডা, সিরু, গোরাল ও পাহাড়ি কালো ভালুক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। রয়েছে বহু প্রজাতির মাছ— মহাশোল, কাট্‌লি, ট্রাউট প্রভৃতি। সালামাণ্ডার ও বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙও রয়েছে এ জাতীয় উদ্যানে।

এই জাতীয় উদ্যানটি দার্জিলিং জেলার উত্তর পশ্চিমে সীমান্তে অবস্থিত। একটি গাড়িচলা পথ দার্জিলিং থেকে ঘুম ঘুরে মানেভঞ্জন পর্যন্ত গেছে, এ ছাড়া একটি পাহাড়ি রাস্তা শিলিগুড়ির সঙ্গে মানেভঞ্জনের সংযোগ ঘটিয়েছে। মানেভঞ্জন থেকে একটি গাড়িচলা পথ টংলু ও সন্দকফু ধরে ফালুট পর্যন্ত গেছে। আর একটি রাস্তা মানেভঞ্জন থেকে ফালুট হয়ে রিমবিক পর্যন্ত রয়েছে। নিকটবর্তী শহর দার্জিলিংয়ের দূরত্ব প্রায় 52 কিলো মিটার। নিকটবর্তী বিমানবন্দর বাগডোগরা জাতীয় উদ্যান থেকে দূরত্ব প্রায় 110 কিলো মিটার ও নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঘুম জাতীয় উদ্যান থেকে দূরত্ব 80 কিলো মিটার।

জাতীয় উদ্যান দেখতে হলে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ওয়াইল্ডলাইফ, দার্জিলিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি 1949 সালে প্রথম সরকারীভাবে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয়— মোট আয়তন প্রায় 127 বর্গ কিলো মিটার। ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972 অনুযায়ী এটি 1976 সালে অভয়ারণ্য হিসাবে পুনর্ঘোষিত হয়েছে। তিস্তা ও মহানন্দা এই দুই নদীর মধ্যবর্তী এই অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে মহানন্দার উপর এক কৃত্রিম জলাধার আছে। বনাঞ্চলের শতকরা প্রায় 60 ভাগ পার্বত্যভূমি ও বাকি অংশ সমতল। উচ্চতা 150 মিটার থেকে 1300 মিটার পর্যন্ত হিমালয় ঢালে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুপম।

এই অভয়ারণ্যটি বন ও বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতি রয়েছে এ বনে। শাল, খয়ের, শিশু, শিমুল, শিরিষ, লালি, চিলৌনি, চিকরাশি, উদাল, পিটালি, বহেরা, আমন, টুন, চাঁপ, মিঠা প্রভৃতি রয়েছে এ অভয়ারণ্যের প্রাকৃতিক বনে। এ অভয়ারণ্যের নীচের দিকে রোপিত শালের বন। এই ধরনের বন আটশো মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অবস্থিত। সমতলক্ষেত্রে প্রধানত শাল, সেগুন, চাপ, জারুল, শিশু, গামার, চিকরাশী প্রভৃতি বৃক্ষের দেখা পাওয়া যায়। আটশো মিটারের ঊর্ধ্বে রয়েছে উৎকৃষ্ট নিবিড় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত উদ্ভিদের মেলা— যার মধ্যে উটিস, আঙ্গারে, ফার্ন ও এপিফাইট জাতীয় গাছ উল্লেখযোগ্য।

বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে মহানন্দা অদ্বিতীয়। সিরু, হিমালয়ের কালো ভালুক, গাউর, চিতাবাঘ, হাতি, বুনোশুয়োর, চিতল হরিণ, সম্বর, কাকার হরিণ, অসমীয়া বানর, সজারু, গোসাপ, গিবন ও সর্বোপরি বাঘের উপস্থিতি এ অভয়ারণ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পাখির বৈচিত্র্যেও এই অভয়ারণ্য অসাধারণ। শীতকালে বহু যাযাবর পাখির দেখা পাওয়া যায় এখানে। পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাইরঙা ভারতীয় কেশরাজ ও বড় ভারতীয়

ধনেশ, ভীমরাজ, মদনা ফুলটুসি, লালমাথা বাঁশপাতি, কালো বুলবুল, মেরুন ওরিয়ল, মালকোহা প্রভৃতি।

বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে মাত্র 22 কিলো মিটার দূরে রয়েছে এ অভয়ারণ্যের প্রবেশ পথ। 31 নম্বর জাতীয় সড়ক মহানন্দা অভয়ারণ্যকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এ অভয়ারণ্যের 6-7 কিলো মিটার দূরে রয়েছে নিউজলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি রেল স্টেশন। এছাড়া দুটি পাহাড়ি রাস্তা— একটি অভয়ারণ্যের পশ্চিম সীমানা ধরে দার্জিলিং এবং অন্যটি পূর্ব সীমান্ত ধরে কালিম্পং শহর পর্যন্ত চলে গেছে।

নিকটবর্তী শহর শিলিগুড়িতে পর্যটন আবাস ও বহু হোটেল রয়েছে। এই অভয়ারণ্যের মধ্যে শুকনাতে বনবিভাগের সুন্দর বাংলো রয়েছে। এছাড়া পর্যটনের সুবিধার জন্য কৃত্রিম জলাধার ও পর্যবেক্ষণ মিনার রয়েছে অভয়ারণ্যের ভেতরে বন্যপ্রাণী দেখার সুবিধার জন্য। বনবিভাগের বাংলোর বুকিং-এর জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, দার্জিলিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

জোরপোখরি সালামাণ্ডার অভয়ারণ্য

1985 সালের মার্চ মাসে জোরপোখরি সালামাণ্ডার অভয়ারণ্যটি সরকারিভাবে ঘোষিত হয়। দার্জিলিং জিলার জোরপোখরিতে সালামাণ্ডারের সংরক্ষণের জন্য একটি হ্রদে অভয়ারণ্যটি তৈরি হয়েছে। আয়তন প্রায় 4 হেক্টর।

সালামাণ্ডার প্রাণীটির প্রাগৈতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। পুরাণে কথিত আছে এই জাতীয় প্রাণীটি আগুনে বাস করার ক্ষমতা রাখত। এই উভচরের নরম ও ভিজে চামড়া অগ্নিনিরোধক বলে বিশ্বাস করা হত। ভারতীয় সালামাণ্ডার একটি দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি তাই ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972 অনুযায়ী সংরক্ষিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ইউরোপে কয়েক লক্ষ বছর আগে এই প্রাণী প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়েছে। বিরল পর্যায়ভুক্ত এই প্রাণীটি দার্জিলিংয়ের পর্বতাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসী এ বিরল প্রাণীটির নাম দিয়েছে গোরা। এ বিরল প্রাণী প্রজাতিটি জোরপোখরি অভয়ারণ্যে স্বাধীনভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে ও পর্যটকদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জোরপোখরি অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর সুখিয়াপোখরি সড়ক পথে দার্জিলিং ও মিরিকের সঙ্গে যুক্ত। দার্জিলিং শহরের 28 কিলো মিটারের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এই অভয়ারণ্যটি পর্যটকরা অনায়াসেই ভ্রমণ করতে পারেন। রাত্রিবাসের জন্য নিকটেই বনবিভাগের বাংলো রয়েছে— লেপচাজগৎ-এ।

নেওড়া উপত্যকা জাতীয় উদ্যান

সিকিম ও ভুটান সংলগ্ন নেওড়া উপত্যকায় জাতীয় উদ্যানটি দার্জিলিং জেলার উত্তর পূর্বে কালিম্পং মহকুমার অন্তর্গত। 1986 সালের এপ্রিল মাসে সরকারিভাবে জাতীয় উদ্যানের সম্মান পায়। এই জাতীয় উদ্যানের উচ্চতার তারতম্য 350 মিটার থেকে 3170 মিটার পর্যন্ত। জাতীয় উদ্যানের মোট আয়তন প্রায় 88 বর্গ কিলো মিটার। এ বনভূমিটি পর্বতময় এবং বর্হিহিমালয়ের অংশ বিশেষ। নেওড়া নদীর নামেই জাতীয় উদ্যানের নাম। এছাড়া খসুম, ধাউলী, পঞ্চপোখরি এবং নাজুরখোলা প্রভৃতি নালাও জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উচ্চতার তারতম্যের সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার তারতম্যও লক্ষণীয়। বর্ষাকাল মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। শীতকালে প্রায় বরফ পড়ে। পর্বতের সানুদেশে তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি থেকে 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং উপরে 0 ডিগ্রি থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বন্য ও বন্যপ্রাণীর অসাধারণ বৈচিত্র্য রয়েছে এ জাতীয় উদ্যানে। বিভিন্ন বনের ভাগ লক্ষ করা যায় এখানে— যথা শুষ্ক মিশ্র বন, আর্দ্র মিশ্র বন, মধ্য পার্বত্য বন, উচ্চ পার্বত্য বন, সরলবর্গীয় বন, রোডোডেনড্রনের বন। উচ্চতার হিসেবে এ বনের ভাগ, বিশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধান এনে দেয়। খয়ের, শিশু, শিরিষের নদীভিত্তিক বনও রয়েছে এ জাতীয় উদ্যানে। বলা বাহুল্য এ জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে উদ্ভিদবিজ্ঞানী থেকে সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী করে তোলে।

বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যেও এ জাতীয় উদ্যান অনন্যতার দাবি করতে পারে। চিতাবাঘ, বিভিন্ন বিড়াল জাতীয় প্রজাতি, রেড পাণ্ডা, কাঠ বিড়ালি, বনরুই জাতীয় প্রাণী, কাকার, সম্বর, গোরাল, সেরু, গৌর ও বিভিন্ন পাখি প্রজাতি জাতীয় উদ্যানকে বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যে অনন্য করে তুলেছে। ইদানীং বেশ কয়েকটি বাঘেরও সন্ধান পাওয়া গেছে নেওড়ায়। হিমালয়ের পাখি যেমন, ব্লু-ম্যাগপাই, হলদে ও কালো বুলবুল।

উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে অব্যবহৃত অরণ্য এই নেওড়া উপত্যকা জাতীয় উদ্যান। প্রায় 25 কিলো মিটার লম্বা ও 7 কিলো মিটার চওড়া এই অঞ্চলের নির্ঝরধারা, পাহাড়, বনভূমি ও বন্যপ্রাণী পর্যটকদের অত্যন্ত আকৃষ্ট করে।

নিকটবর্তী রেলস্টেশন 'চালমা' (শিলিগুড়ি আলিপুরদুয়ার মিটার গেজ লাইন) জাতীয় উদ্যান থেকে প্রায় 30 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত। নিকটবর্তী বিমানবন্দর বাগডোগরা জাতীয় উদ্যান থেকে প্রায় 100 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত।

এ জাতীয় উদ্যান ভ্রমণের অনুমতির জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, পো: ও জেলা দার্জিলিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

সেঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

1915 সালের সরকারিভাবে ঘোষিত শিকারপ্রাণী সংরক্ষিত কেন্দ্র ও 1976 সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃত সিঞ্চল, হিমালয়ের কোলে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার। এ অভয়ারণ্যটির বিস্তৃতি আট হাজার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট টাইগার হিল পর্যন্ত। এই অভয়ারণ্যের মোট আয়তন 38.60 বর্গ কিলো মিটার। টাইগার হিল থেকে অনিন্দ্যসুন্দর সূর্যোদয় দেখা পর্যটকদের কাছে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

সিঞ্চলে নিবিড় স্বাভাবিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দু'রকম বনই রয়েছে। এই অভয়ারণ্যের দু'হাজার থেকে দু'হাজার চারশো মিটার উচ্চতার মধ্যে বিভিন্ন গাছপালার দেখা মেলে। ঘন ওকগাছ, কাপাসী, কাটুস, কাওলা, চাঁপা, বাঁশ ও বিভিন্ন প্রকার ফার্ন প্রভৃতি। দু'হাজার চারশো মিটারের বেশি উচ্চতায় রোডোডেনড্রনের বিচিত্র শোভা পর্যটকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এছাড়া রয়েছে পিপলি, উটিস, ধুপি, চাপ প্রভৃতি বৃক্ষ। এই অঞ্চলে প্রথম বৃক্ষরোপণ শুরু হয় 1892 সালে।

এ পাহাড়ি অভয়ারণ্যে কাকার হরিণ, বুনো শুয়োর, গোরাল, সেরু, পাহাড়ি কালো ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বন বিড়াল, চিতা বিড়াল, আসামীজ বানর, শিয়াল, প্রভৃতি বিচিত্র বন্যপ্রাণী দেখা যায়। পাখির মধ্যে এখানে আছে হরিয়াল, রামঘুঘু, সোনালি কাঠঠোকরা, হিমালয়ের কালো কাঠঠোকরা, চোর পাখি প্রভৃতি অনেক প্রজাতির পাখিরই দেখা মেলে।

দার্জিলিং শহর থেকে এই অভয়ারণ্যের দূরত্ব মাত্র 11 কিলো মিটার। জোড়াবাংলোর খুব কাছেই সিঞ্চল অভয়ারণ্য।

বক্‌সা ব্যাঘ্র প্রকল্প

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার বিরাজ করছে বকসা বনভূমি। এর মোট আয়তন প্রায় 759 বর্গ কিলো মিটার। বক্‌সার এই বনভূমি 1982-83 সালে সরকারিভাবে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে ঘোষিত হয়। বনভূমির 315 বর্গ কিলো মিটার কোর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ও এই সংরক্ষিত এলাকাকে সরকারিভাবে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে 1986 সালে ঘোষণা করা হয়। অভয়ারণ্যটি ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী মৌসুমী শাল অরণ্য অঞ্চলে পড়েছে। বনভূমির বেশির ভাগটাই পর্বতের পাদদেশে ভাবর ও তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 152 মিটার থেকে 1,755 মিটার পর্যন্ত। অরণ্যের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি নদী বয়ে, এদের মধ্যে প্রধান— পানা, ডিমা, রায়ডাক, বালা, গাবুর, বাস্‌রা ও সঙ্কোষ প্রভৃতি।

বনভূমিটির গাছপালার তারতম্য প্রধানত ভূখণ্ড, জলনিকাশী ব্যবস্থা ও মাটির আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। সমভূমি ও পর্বতের সানুদেশের বিরাট অংশ জুড়ে শালবন আছে। এই বনভূমিটিতে বিভিন্ন গাছের দেখা পাওয়া যায়— চিলাউলে, চিকরাশী, বহেড়া, সিধা,

বকসার জঙ্গলে নদী পার হচ্ছে গাউর।

টুন, লালি, লসুনে প্রভৃতি বৃক্ষ উল্লেখযোগ্য। নদীভিত্তিক অঞ্চলে খয়ের, শিশু, শিমুল, শিরীষের সহাবস্থান চোখে পড়ার মতো। পার্বত্য বনভূমিতে কাটুম, মান্দালে, লাম্পতি, কিম্বু, পানিসাজ, গোকুল প্রভৃতি গাছপালা উল্লেখযোগ্য। বাক্সার বনে বেশ কিছু আদিম বনের উপস্থিতি রয়েছে যা দেখে দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়।

বাঘ ছাড়া এখানে চিতাবাঘ, বনবিড়াল, বুনো কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। বিশেষ ঋতুতে স্থান পরিবর্তন কালে ভ্রাম্যমান বিরাট হাতির পাল দেখা যায়। এছাড়া রয়েছে গাউর, চিতল হরিণ, ভাল্লুক, থর, বন্য ছাগল, দীঘলচক্ষু সম্বর, কাকার হরিণ ও বিভিন্ন প্রকার সাপ ও গোসাপ। পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্লু-রক থ্রাশ, ব্ল্যাক বার্ড, হরিয়াল, বড়কাও ধনেশ, সাদা গাল বুলবুল, হাজারিকা, ভীমরাজ, মদন প্রভৃতি। জলে শীতে ভিড় জমায় মিটুয়া, বাটান আর ম্যারগ্যানজার-এর বাস।

বনভূমি দেখার প্রকৃষ্ট সময়, নভেম্বর থেকে এপ্রিল।

এই ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বনবিশ্রামগৃহ রয়েছে। রাত্রিবাসের বনবিশ্রামগৃহের জন্য ফিল্ড ডাইরেক্টর, বক্সা, পো: রাজাভাতখাওয়া, জিলা : জলপাইগুড়ি অনুমতি দিয়ে থাকেন।

আলিপুরদুয়ার জংশন এই সংরক্ষিত এলাকার প্রাণকেন্দ্র (রাজাভাতখাওয়া মিটার গেজ জংশন স্টেশন থেকে মাত্র 16 কিলো মিটার দূরে)। প্রকল্প অঞ্চল থেকে নিকটবর্তী রেল স্টেশন আলিপুরদুয়ার 25 কিলো মিটার। নিকটবর্তী বিমানবন্দর : বাঘডোগরা 70 কিলো মিটার দূরে। 31-এ জাতীয় সড়ক এই ব্যঘ্র সংরক্ষণ এলাকার পূর্ব সীমানা নির্দিষ্ট করেছে।

বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

প্রথমে এটি একটি বৃগদাবরূপে পরিচিত ছিল। 1977 সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মোট আয়তন 2 বর্গ কিলো মিটার। হরিণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লাল কাঁকর মাটিতে 1953 সাল থেকে এখানে নানাধরনের গাছপালা রোপণ ও নতুন বনসৃজন শুরু হয়। যার ফলে ভূমির অবক্ষয়ও রোধ হয়েছে। দুটি জলাশয় এবং নজরমিনার রয়েছে এই অভয়ারণ্যে। শাল, আকাশমণি, শিশু, আমলকী, বহেড়া, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের পরিবেশে চিতল হরিণ কৃষ্ণসার প্রাণীরা বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। এছাড়া রয়েছে বেজী, খরগোশ, শেয়াল প্রভৃতি প্রাণী। পাখিদের এক বিশাল সমারোহ-এ অভয়ারণ্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। জলাশয়ে শীতকালে স্থানীয় ও যাযাবর পাখির আনাগোনা শুরু হয়। এই সব পাখির মধ্যে রয়েছে নাক্‌টা, পানকৌড়ি, রাজহাঁস, বড়দীঘর, বড়িহাঁস। টিটি, ডাহুক প্রভৃতি। শীতের মরশুমে ফুলটুসি, লম্বপুচ্ছ জলপিপি, বেনেবউ, দোয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ফটিকজল, খঞ্জন, লালমুনিয়া, তিলে মুনিয়া, গাং শালিক, শালিক, ছাতারে, হাঁড়িচাচা, তিলে ঘুঘু, কোকিল, চোখগেল, নীলকণ্ঠ, মাছরাঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির সমারোহ ঘটে এ অভয়ারণ্যে।

অভয়ারণ্য দেখার উপযুক্ত সময় : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

অভয়ারণ্যটি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের কাছে অবস্থিত। শান্তিনিকেতন টুরিস্ট লজ ও বোলপুরে বনবিভাগের বিশ্রামগৃহ আছে। টুরিস্ট লজের বুকিংয়ের জন্য কেয়ার টেকার শান্তিনিকেতন টুরিস্ট লজ ও বনবিভাগের বিশ্রামগৃহের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, বীরভূম ডিভিশন, পোঃ সিউড়ি, জিলা : বীরভূম। এর সঙ্গে যোগযোগ করতে হবে।

অভয়ারণ্য থেকে নিকটবর্তী রেল স্টেশন বোলপুর, 3 কিলো মিটার। নিকটবর্তী এয়ারপোর্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্র এয়ারপোর্ট, দমদম, কলকাতা, 115 কিলো মিটার।

বিহার

বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প

1970 সালে বিহার রাজ্যের উত্তর ভাগে, ইন্দো-নেপাল সীমান্তে প্রায় 461 বর্গ কিলো মিটার জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে এই অভয়ারণ্য।

তরাইয়ের এই ঘন ঘাসের বন, মিশ্র পর্ণমোচী গাছের গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে জলা-জমি, গভীর গিরিখাত ও নদী সংলগ্ন গভীর অরণ্য নানান ধরনের বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল। উত্তরে নেপালের চিতোয়ান জাতীয় উদ্যান থেকে অনেক সময়েই নানান

পশুপাখি এই জঙ্গলে চলে আসে — যেমন, বাঘ, গন্ডার, গাউর প্রভৃতি। এই ব্যাঘ্র প্রকল্পে নানান হিমালয়ান পাখি আছে, যেমন — কালোপিঠ ও সোনালি কাঠঠোকরা (Blackbacked and Goldenbacked Woodpecker), নানান ধরনের ঈগল প্রভৃতি। আর যেসব বন্য জন্তু এই জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায় তা হল পাড়া হরিণ (Hog deer), চিতল (Cheetal), বাঘ, সম্বর (Sambar), ভাল্লুক (Sloth bear), আর সেরো (Serow) প্রভৃতি। বর্তমানে এই জঙ্গলটি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীন।

জঙ্গলের মধ্যে থাকার তেমন কোনো বন্দোবস্ত না থাকলেও বাইরে গড়ে উঠেছে কিছু পর্যটন নিবাস।

এখানে থাকবার জন্য যোগাযোগ করতে হবে, ডেপুটি ডাইরেক্টর, চম্পারন ফরেস্ট ডিভিশন, বিহার।

কৈমুর অভয়ারণ্য

এই অভয়ারণ্যের শুরু খুব বেশিদিনের নয়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের এই দুই রাজ্যের সীমানায়, শোণ নদীর পশ্চিম পাড়ে, এই অরণ্যের নয়নাভিরাম দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। এখানে যা বন্য প্রাণী পাওয়া যায় তাদের মধ্যে চৌশিঙ্গা, চিঙ্কারা, নেকড়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে যেহেতু গরম খুব বেশি তাই নভেম্বর থেকে মার্চ জঙ্গল ঘুরে দেখবার সবচেয়ে ভাল সময়। সাসারাম থেকে প্রায় 31 কিলো মিটার দূরে এই অরণ্যে ঢোকাবার অনুমতি দেন ডি. এফ. ও., শাবাদ ডিভিশন, জেলা-রোটাস, বিহার।

উদয়পুর অভয়ারণ্য

1978 সালে মাত্র 6 বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে উদয়পুর অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্য প্রধানত শীতকালীন পরিযায়ী পাখিদের জন্যে প্রসিদ্ধ। নানান ধরনের জলের পাখি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে মার্চ এই সময় স্বাভাবিকভাবেই পাখির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই অভয়ারণ্যে মাত্র একটাই রেস্ট হাউস আছে। চম্পারণ জেলার এই অভয়ারণ্যে প্রবেশ করবার অনুমতি ডেপুটি ডাইরেক্টর (চম্পারণ ফরেস্ট ডিভিশন) দিয়ে থাকেন।

মণিপুর

কৈবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান

1954 সালে প্রথম কৈবুল লামজাও অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। অভয়ারণ্যের মোট আয়তন 36 বর্গ কিলো মিটার। পরবর্তীকালে এই অভয়ারণ্য জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাচুনে হরিণ কৈবুল লামজাওয়ের অধিবাসী। মণিপুরী ভাষায় নাচুনে হরিণকে বলে সাংগাই। মণিপুরের বিজ্ঞাপনে সাংগাই সকলেরই চোখে পড়বে। জাতীয় উদ্যানের মাত্র 6 বর্গ কিলো মিটার ভাসমান গাছপালা যাকে ফুমদি বলা হয় — এরই উপরে ব্রাউ-এনটলারড (Brow Antlered) ডিয়ার বা নাচুনে হরিণ নৃত্যরত। উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে নাচুনে হরিণদের দেখাই বেশ কষ্টকর। এ হরিণদের চলার স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় নৃত্যের ছন্দ থাকায় মনে হয় যেন হরিণরা নেচেই চলেছে। তাই এদের নাম নাচুনে হরিণ। লোগতাক হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত এই কৈবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান ইম্ফল শহর থেকে প্রায় 32 কিলো মিটার দূরে। 1989 সালের সুমারি অনুযায়ী এখানে 52টি নাচুনে হরিণ বা সাংহাই পাওয়া যায়। সাংহাই ছাড়াও এ জাতীয় উদ্যানে রয়েছে হগ ডিয়ার (Hog deer), ফিশিং ক্যাট (Fishing Cat) ও বুনো শুয়োর। বহু বিচিত্র পাখির কল কাকলিতেও মুখর থাকে এই জাতীয় উদ্যান।

এখানে পর্যটন ব্যবস্থা এখনও বিশেষ গড়ে ওঠেনি। পর্যটনের সুবিধার জন্য এখানে রয়েছে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকো। রাত্রি বাসের জন্য সেনড্রা ও ফুবালা নামক দুটি স্থানে বনবিভাগের দুটি সুন্দর বিশ্রামাগার। জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ ও বিশ্রামাগারে থাকার অনুমতির জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ডলাইফ, কাইবুল লামজাও ন্যাশনাল পার্ক। পো: খাথিমুঙ্গে, মণিপুর-এর যোগাযোগ প্রয়োজন। জাতীয় উদ্যান থেকে নিকটবর্তী শহর ও বিমান বন্দর ইম্ফল 32 কিলো মিটার দূরে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডিমাপুর জাতীয় উদ্যান থেকে 229 কিলো মিটার দূরে।

সিরোহি জাতীয় উদ্যান

মণিপুর বার্মার সীমানায় মণিপুর রাজ্যের দ্বিতীয় জাতীয় উদ্যান হচ্ছে সিরোহি। এখনও বেশ ছোট ছোট বনাঞ্চল নিয়ে রয়েছে এ জাতীয় উদ্যান কিন্তু ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় 200 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চলের উপরে জাতীয় উদ্যানের ভবিষ্যত রূপরেখা। বন ও বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যে সিরোহিও অনন্য। অসাধারণ পাখি প্রজাতির ঐশ্বর্য রয়েছে এ জাতীয় উদ্যানে। বিভিন্ন প্রকারের ফেজেন্ট (Pheasant) পাখির বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই জাতীয় উদ্যানের পর্যটন ব্যবস্থা অপ্রতুল। এই জাতীয় উদ্যানের মধ্যে এখনও কোনও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা নেই পর্যটকদের জন্য।

মিজোরাম

ডাম্পা ব্যাঘ্র প্রকল্প

1976 সালে 300 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে ডাম্পা অভয়ারণ্য ঘোষিত হয় মিজো পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে। এ অভয়ারণ্যের শতকরা কুড়ি ভাগ জায়গা জুড়ে আছে বিভিন্ন প্রকার বাঁশের প্রজাতি। বাকি অংশে রয়েছে সেমি এভারগ্রিন বন। ধলেশ্বরী নদী ও শাখানদী ডাম্পা অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। বৃহদাকার স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী প্রজাতিদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, লেপার্ড, হাতি, হুলুক গিবন, সোয়াম্প ডিয়ার প্রভৃতি।

ভ্রমণের ভাল সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। এখানে বনবিভাগের দুটি বিশ্রামাগার রয়েছে। অভয়ারণ্যে প্রবেশ ও রাত্রিবাসের অনুমতির জন্য চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন, মিজোরাম, আইজলের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর ফাইলেং 10 কিলো মিটার দূরে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলচর 290 কিলো মিটার ও নিকটবর্তী বিমান বন্দর আইজল 70 কিলো মিটার দূরে।

মহারাষ্ট্র

মেলঘাট বাঘ প্রকল্প

মহারাষ্ট্রে অমরাবতী জেলায় গোঁরী লাপড় পাহাড়কে ঘিরে সেগুন গাছের যে বনভূমি আছে, 1973 সালে তাকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনে আনা হয়, মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্প নাম দিয়ে। বর্তমানে এই জঙ্গলটির আয়তন 1619 বর্গ কিলো মিটার। দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্যাঘ্র প্রকল্প।

হাওড়া-মুম্বাই (ভায়া নাগপুর) রেলপথে পড়ে মধ্য রেলে স্টেশন বাদ্‌নেরা। এখান থেকে 8 কিলো মিটার বাসে আসতে হবে অমরাবতী। অমরাবতী থেকে বাসে যেতে হবে 56 কিলো মিটার দূরে ডিরেক্টরের অফিস, পারাতওয়ারা — অথবা 110 কিলো মিটার দূরে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার এর সদর সেমাদোতে। এখানেই জঙ্গলের প্রবেশ পথ।

এই জঙ্গলের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 500 থেকে মিটারের 1178 মধ্যে। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে জঙ্গলের উত্তরের সীমানা বরাবর বয়ে গেছে তাপী নদী। বনভূমির সর্বোচ্চ বিন্দুর নাম বৈরাট। এখানে দু'ধরনের জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়, শুষ্ক সেগুনের জঙ্গল ও মিশ্র পর্ণমোচী জঙ্গল। এখানে যেসব গাছ দেখা যায়, তা হল সেগুন, মোহা, জাম, বয়ড়া, অর্জুন, আমলকী প্রভৃতি।

বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভাল্লুক, ঢোল ছাড়াও এখানে সন্ধান মেলে গাউর, চিতল, সম্বর, বনশুয়োর প্রভৃতি প্রাণীর। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনে আনার পর এখানে বন্য জন্তুর সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাখির মধ্যে বনমুরগি, বটের, ডাহুক, সাদা কাঁক, বাজ্‌কা ও বিভিন্ন জাতের ঈগল পাওয়া যায়।

মেলঘাট এলাকায় প্রধানত তিন শ্রেণীর আদিবাসীর দেখা পাওয়া যাবে। এরা হল — গোঁড়, কোরক, গাওয়ালি।

বর্তমানে জঙ্গলে ঘোরবার জন্য জিপের ব্যবস্থা আছে। বন্যপ্রাণী দেখবার জন্য বনদপ্তরের একটা মিনিবাসও আছে। এই জঙ্গলটিতে বন্যপ্রাণী দেখবার শ্রেষ্ঠ সময় জানুয়ারি থেকে জুন।

'সেমাদো'-তে 10টি দ্বি-শয্যা বিশিষ্ট হাট ও 40 শয্যা বিশিষ্ট ডর্মিটারি আছে।

আগে থেকে অর্ডার দিলে সেমাদো-তে খাবার বন্দোবস্ত করা যায়।

তাড়োবা ব্যাঘ্র প্রকল্প

মহারাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় উদ্যান তাড়োবা। চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে 116 বর্গ কিলোমিটার বনভূমি নিয়ে চন্দ্রপুর জেলায় স্থাপিত হয় এ অভয়ারণ্য 1935 সালে। 1955 সালে এই সংরক্ষিত অরণ্যটিকে জাতীয় উদ্যানে উন্নীত করা হয়।

নাগপুর থেকে তাড়োবার দূরত্ব 151 কিলো মিটার। নিকটতম রেল স্টেশন চন্দ্রপুর থেকে এর দূরত্ব 45 কিলো মিটার। এই উভয় জায়গার সঙ্গেই তাড়োবার বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।

এই বনভূমিটি রয়েছে একটি মিষ্টি জলের হ্রদকে ঘিরে। হ্রদটি 12 মিটার গভীর এবং এর আয়তন 120 হেক্টর। তাড়োবা প্রধানত মিশ্র শালের জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় আছে। জঙ্গলের ভেতর ভাল রাস্তা আছে।

এখানে বাঘের থেকে বেশী দেখা যায় চিতা বাঘ। বাঘ মাঝে মাঝে এখানে চলে আসে, তবে কদাচিৎ তাদের দেখা মেলে। চিতল, সম্বর, নীলগাই ছাড়া এখানে যথেষ্ট সংখ্যায় আছে বুনো শুয়োর। কিছু গাউরও আছে এই জঙ্গলটিতে।

তাড়োবাতে একটি কুমীর প্রকল্প আছে। রঙবেরঙেরও পাখিরও দেখা মেলে এই জঙ্গলটিতে। টিয়া, চন্দনা, দোয়েল, বেনেবউ, বসন্তবৌরী, নানা জাতের বক ও হেরনও রয়েছে। শীতে যাযাবর হাঁস উড়ে আসে লেকটিতে।

এখানে জঙ্গল ঘোরবার জন্য চন্দ্রপুর থেকে জিপ ভাড়া করে আনাই ভাল। তবে বনদপ্তরের একটা মিনিবাস আছে। এখানে সন্ধ্যার ঠিক মুখেই জঙ্গলে প্রবেশ করা শ্রেয়।

অক্টোবর থেকে জুন এখানে আসবার উপযুক্ত সময়। কখনোই তাপমাত্রা 90 সেন্টিগ্রেডের নীচে বা 470 সেন্টিগ্রেডের উপরে ওঠে না। বর্ষায় পার্ক বন্ধ থাকে।

এখানে রয়েছে একটি গেস্ট হাউস ও দুটি রেস্ট হাউস। এছাড়া আছে ইন্সপেকশন হাট।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়েস্ট চন্দ্রপুর ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট — চন্দ্রপুর, মহারাষ্ট্র।

নাওয়েগাঁও জাতীয় উদ্যান

মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা জেলায় কোহামারাতে নাওয়েগাঁও জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ দ্বার। 6 নং জাতীয় সড়কের দক্ষিণের রাস্তা সোজা গিয়ে পৌঁছেছে নাওয়েগাঁও-এর বনবাংলোয়। এখানকার রেলওয়ে স্টেশনটি জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারের এক কিলো মিটার দূরে ন্যারো গেজ লাইনের উপর অবস্থিত। নাগপুর শহর থেকে এই জঙ্গলের দূরত্ব 119 কিলো মিটার।

এই জাতীয় উদ্যানটি গড়ে উঠেছে 45 বর্গ কিলো মিটার ইটিয়াডোহ লেককে ঘিরে। নিশানী পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা জঙ্গলে সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির উচ্চতা 2299 ফিট।

133 বর্গ কিলো মিটার এই জাতীয় উদ্যানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত। জঙ্গলের মাঝে মাঝেই রয়েছে নজর মিনার (ওয়াচ্ টাওয়ার)। এই টাওয়ারগুলির উপর থেকে জঙ্গলের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। তাছাড়া ইটিআডোহ লেকে পাখি দেখবার জন্য নৌকাবিহারের সুবন্দোবস্ত আছে।

এই জাতীয় উদ্যানের ভেতরেই একটি মৃগদাব আছে, শিশুদের জন্য যা একটি বাড়তি আকর্ষণ।

এই জঙ্গলে যে সমস্ত বন্য জন্তুর দেখা মেলে, তা হল বাঘ, চিতাবাঘ, ভারতীয় গাউর, সম্বর, নীলগাই, চিতল হরিণ, কাকার হরিণ, চিঙ্কারা প্রভৃতি। নাওয়েগাঁও জাতীয় উদ্যানে ঈগলের অনেক প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া হাজারিকা, নানান জাতের টিট, ওয়ার্বলার, চাতক, চোরপাখি, বিভিন্ন জাতের ফ্লাইক্যাচার প্রভৃতি পাখির দেখা পাওয়া যায়।

জঙ্গলে ঘোরবার জন্যে এখানে হাতির ব্যবস্থা নেই। পার্কের নিজস্ব কোনো জিপেরও বন্দোবস্ত এখানে নেই। সুতরাং জিপের ব্যবস্থা আগে থেকেই নিজেদেরই করা শ্রেয়।

এখানে বেড়াবার শ্রেষ্ঠ সময় হল এপ্রিল ও মে।

মেঘালয়

নংখাই অভয়ারণ্য

এ অভয়ারণ্যটি 1981 সালে ঘোষিত হয় সরকারিভাবে 29 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে। এ অভয়ারণ্যের বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতির মধ্যে রয়েছে বিন্টুরং, ক্লাউডেড লেপার্ড, গোলডেন ক্যাট ও লেপার্ড ক্যাট।

এই অভয়ারণ্যটিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও বাড়িয়ে শাল-পাইন টেনশন জোন পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে ও তখন এই অভয়ারণ্যের মোট আয়তন বেড়ে 180 বর্গ কিলো মিটার হবে। বন্য হাতিসংরক্ষণের জন্য এরূপ সম্প্রসারণ প্রয়োজন বলে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত।

এ অভয়ারণ্যের পর্যটন ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি। এখানে দুটি বনবিভাগের বিশ্রামাগার রয়েছে। এ অভয়ারণ্য দেখার অনুমতি ও বিশ্রামাগারে রাত্রিবাসের জন্য চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন, মেঘালয়, শিলংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। অভয়ারণ্য দেখার প্রকৃষ্ট সময় অক্টোবর থেকে মে মাস। অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী শহর, রেলস্টেশন ও বিমানবন্দর গৌহাটি অভয়ারণ্য থেকে 65 কিলো মিটার দূরে।

সিজু অভয়ারণ্য

কেবলমাত্র 5 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে মেঘালয়ের গারোহিলে 1979 সালে অভয়ারণ্য স্থাপিত হয়েছে। এই বিশিষ্ট অভয়ারণ্যের হচ্ছে শালের অন্যান্য বৃক্ষরাজির মিশ্র-বন। এরই সঙ্গে 0·31 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে আরও একটি অভয়ারণ্য, যার নাম বাঘমারা পিচার প্লান্ট অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্যটি গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিপন্ন বৃক্ষ প্রজাতি পতঙ্গভুক পিচার প্লান্টকে সংরক্ষণ করা।

পর্যটন ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি সমৃদ্ধি নয়। বনবিভাগের একটি সুন্দর বিশ্রামাগার আছে, যেখানে রাত্রিবাস করা ও অভয়ারণ্যে প্রবেশের অনুমতির জন্য চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন, মেঘালয়, শিলংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। অভয়ারণ্য ভ্রমণের ভাল সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চ। নিকটবর্তী শহর তুরা অভয়ারণ্য থেকে 40 কিলো মিটার দূরে। নিকটতম রেল ও বিমান বন্দর গৌহাটি 210 কিলো মিটার।

বালফাক্রাম জাতীয় উদ্যান

মেঘালয়ের গারোহিলে 200 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে বালফাক্রাম জাতীয় উদ্যান ঘোষিত হয়েছে 1988 সালে। এ ন্যাশনাল পার্কটির জীববিজ্ঞানরূপ মূল্যায়ন এখনও পুরোপুরি করা সম্ভব হয়নি — তবে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যে এই জাতীয় উদ্যানটি

বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। বহু বিপন্ন উদ্ভিদের পাশাপাশি এখানে রয়েছে বহু বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি যথা হাতি, বুনো মোষ, বাঘ, গিবন (Gibbon) প্রভৃতি। এখানকার জীববিজ্ঞানরূপ মূল্যায়নের প্রয়োজনে এই জাতীয় উদ্যানটিকে বাড়িয়ে 370 বর্গ কিলো মিটার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এখানে একটি বিশ্রামাগার রয়েছে। অনুমতি অবশ্যই ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ডলাইফ, তুরার কাছ থেকে নিতে হবে। পর্যটনের উপযুক্ত সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চ। নিকটবর্তী শহর তুরা 200 কিলো মিটার দূরে। নিকটবর্তী রেল ও বিমানবন্দর গৌহাটি 350 কিলো মিটার দূরে।

নোকরেক জাতীয় উদ্যান

মেঘালয়ের গারোহিলের 47 বর্গ কিলো মিটার বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে নোকরেক্ জাতীয় উদ্যান। বিপন্ন বৃক্ষ প্রজাতি সাইট্রাম ও বহু বিচিত্র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য এই জাতীয় উদ্যানের ঘোষণা। বিপন্ন বন্যপ্রাণীর মধ্যে ক্যাপ্ড লাঙুর, অ্যাসামীজ বাদর (Assamese Monkey), বাঘ, লেপার্ড, আমচিতা (Clouded Leopard), গোল্ডেন ক্যাট (Golden Cat), হিমালয়ান পাম সিভেট (Himalayan Palm Civet), লালপান্ডা (Red Panda), কালো ভাল্লুক (Himalayan Black Bear), হাতি প্রভৃতি।

ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যটনের প্রকৃষ্ট সময়। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে কোনও রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত নেই। নিকটবর্তী শহর তুরা জাতীয় উদ্যান থেকে 80 কিলো মিটার ও নিকটবর্তী বিমান ও রেলস্টেশন গৌহাটী প্রায় 300 কিলো মিটার। চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন, মেঘালয়, শিলংয়ের কাছ থেকে এই জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের অনুমতি সংগ্রহ প্রয়োজন।

মধ্যপ্রদেশ

কানহা ব্যাঘ্র প্রকল্প

মধ্যপ্রদেশের পূর্বদিকের উঁচুভূমিকে ঘিরে যে গভীর জঙ্গল রয়েছে সেখানে ভরে রয়েছে অসংখ্য বন্যপ্রাণী। এখানেই গড়ে উঠেছে কিপলিং-এর স্বপ্নের জঙ্গল "কানহা"। এই জঙ্গলের নাটকীয়তা আর অজস্র প্রজাতির পশুপাখি কিপ্লিং-কে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর জঙ্গল বুক রচনা করতে। বান্জার ভ্যালি প্রজেক্টের অন্তর্গত এই জঙ্গলটিকে 1955 সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। তখন বান্জার ভ্যালি ও হ্যালোন ভ্যালি — এই দুটি অভয়ারণ্যকে যুক্ত করে মাত্র 252 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল কানহার। তারপর নিবিড় রক্ষণাবেক্ষণের ফলে যত বৃদ্ধি পেয়েছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা

ঢোল বা বুনো কুকুর দেখবার সুযোগ বোধহয় কানহার চেয়ে বেশি আর কোথাও নেই।

ততই বেড়েছে কানহার আয়তন। 1976-র পার্শ্ববর্তী সুপ্‌খার অভয়ারণ্যকে কানহার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে এর আয়তন দাঁড়িয়েছে 940 বর্গ কিলো মিটার! বর্তমানে এই জাতীয় উদ্যান ব্যাঘ্র প্রকল্প-র অন্তর্গত।

কানহার নিকটতম শহর মাণ্ডলা — 73 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত। এখানেই রয়েছে বনবিভাগের সদর দপ্তর। আর নিকটতম রেল স্টেশন জব্বলপুরের দুরত্ব 169 কিলো মিটার। জব্বলপুরের বাস টার্মিনাস থেকে সকাল ছটা ও এগারোটায় বাস ছেড়ে 9 কিলো মিটার দূরের কিস্‌লি পৌঁছে দেয় 8 ঘণ্টায়। কানহার নিকটতম বিমানবন্দর নাগপুর।

কানহার শাল, সেগুন, আমলকী, বহেড়া, কুল, জাম, মহুয়া প্রভৃতি আর বাঁশের গভীর জঙ্গলের মাঝে মাঝে আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘাসের সমতলভূমি। এই সমস্ত খোলা ঘাসের জমিতে বিচরণ করে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য হরিণ। ঘাসের জমি আর গহন অরণ্য ভেদ করে রাস্তা পাক খেয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের উপর, বামিনি দাদার-র। এখান থেকে কান্‌হা উপত্যাকার এক উপভোগ্য দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানেই কানহার সর্বোচ্চ বিন্দু। এখানকার সূর্যাস্তও নয়নাভিরাম। বামিনি দাদার-এর যাতাযাতের পথে দেখা পাওয়া যায় — ভারতীয় গাউর, চৌশিঙ্গা আর কাকার হরিণের।

মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জঙ্গলের মতোই এখানকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা বেশ সুসংহত। কর্তৃপক্ষ বেশ কড়া হাতে জঙ্গলের মধ্যে গবাদি পশুর বিচরণ দমন করে থাকেন। জঙ্গলের

ভেতরে বন্যপশুদের জন্য জলের সুবন্দোবস্ত আছে এবং তৃণভোজীদের জন্যে "সল্ট লিক্"-এর ব্যবস্থা আছে। আশেপাশের গ্রামের গবাদি পশু যাতে রোগ সংক্রামণ করতে না পারে, তার জন্যে নিয়মিত ভ্যাকসিন দেবার ব্যবস্থা আছে।

বাঘ দেখার সহজ সুযোগ কান্হাতে। প্রজেক্ট টাইগার-এর আনুকূল্যে এখানে বাঘের সংখ্যা একশোরও বেশি। ভোরে মাহুতরা হাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাঘের খোঁজে। খোঁজ পেলেই ওয়াকি-টকি-তে খবর চলে যায় কিস্‌লি ও কানহা-তে। এবার বনদপ্তরের জিপে করে পৌঁছে যাওয়া যায় বাঘের মুখোমুখি। বাঘের জন্যে নাম-ডাক হলেও, কানহার বিশেষ আকর্ষণ তার বারশিঙ্গা হরিণ (Hardground Barasinga), এ জাতের বারাশিঙ্গা কানহার জঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। জাতীয় উদ্যানের শুরুতে এদের সংখ্যা ছিল মাত্র ষাট। বর্তমানে কানহাতে এই জাতীয় হরিণের সংখ্যা সাড়ে চারশো। নিশ্চিতভাবে এখানে দেখা মেলে কাকার হরিণ আর সম্বরের। চিতল হরিণ, সাধারণ হনুমান আর বনশুয়োরও সর্বত্র। এছাড়া আছে চৌশিঙ্গা হরিণ, নীলগাই, বুনো খরগোস আর ভারতীয় গাউর। মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে বাঘ ছাড়া এখানে আছে চিতাবাঘ, বনবেড়াল, শ্লথ ভাল্লুক, খ্যাঁকশিয়াল, পাতিশেয়াল, বেজী প্রভৃতি। আর যে প্রাণীটি অন্যান্য যেকোন জঙ্গল থেকে এখানে দেখবার সম্ভাবনা বেশি, তাহল ঢোল বা বন্য কুকুর। কৃষ্ণসার হরিণের সংখ্যা এখানে বেশ কমে গেছে, এখন মাত্র দুটিতে এসে ঠেকেছে।

পাখির সংখ্যা এখানে নেহাৎ কম নয়। প্রায় দুশো প্রজাতির পাখির সন্ধান মেলে কানহাতে। বাংলোর আশে পাশেই অনেক রকম পাখির দেখা পাওয়া যায় যেমন — বুলবুলি (Redvented Bulbul), দোয়েল (Magpie Robin), খঞ্জন (Wagtail), বেনেবউ (Blackheaded Oriol), বসন্তবৌরী (Large Green Barbet), কোকিল (Koel), হাঁড়িচাচা (Tree pie), ফিঙে (Drongo), টিয়া প্রভৃতি। জঙ্গলের একটু ভেতরে কিসলির রাস্তায় আছে কেশরাজ (Haircrested Drongo), দুধরাজ (Paradise flycatcher) আর নানা জাতের ব্যাবলার। ইতস্তত চোখে পড়ে ময়ুর আর ছাইরঙা ধনেশ (Grey Hornbill)। ঘাসের জমির কাছাকাছি থাকে লাল বনমুরগি, তিতির, বটের আর পিপিট (Pipit)। এছাড়া কান্হাতে দেখতে পাবেন বিভিন্ন জাতের দামা (Trush), রোজ ফিঞ্চ (Rose Finch), সোনালি কাঠঠোক্‌রা (Golden Woodpecker), বুশচ্যাট (Bushchat), রামগাংরা (Grey Tit), হাজারিকা (Minivet) প্রভৃতির। এখানকার শ্রবণতালে প্রতি বছর উড়ে আসে নানান জাতের যাযাবর হাঁস। তবে সরাল (Lesser Whistling Teal)-ই বেশী।

জঙ্গলে ঢোকার এখানে বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। ভোরে ছ'টা থেকে জিপ আর বিকেল চারটে থেকে বনবিভাগের হাতি পাওয়া যায়। এই দুই সময়ই বন্য জন্তু দেখার শ্রেষ্ঠ সময়।

যদিও ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি বেড়াবার মনোরম সময়, তবে বন্যপ্রাণী দেখবার সবচেয়ে ভাল সময় মার্চ থেকে জুন। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পার্ক বন্ধ থাকে।

কানহায় থাকবার বিভিন্ন বন্দোবস্ত আছে। কানহার 9 কিলো মিটার দূরে কিসলি আর তারও কিছু দূরে খাটিয়া দু-জায়গাতেই ভাল থাকবার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া মুক্কিতে আছে হোটেল-এর বন্দোবস্ত। এখানে শীতে তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে এবং গ্রীষ্মের দাপট প্রবল। কিসলি বা মুক্কিতে বুকিং-এর জন্যে যোগাযোগ করতে হবে — এম.পি.এস.টি.ডি.সি., চিত্রকুট বিল্ডিং, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা।

বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্প

মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে যে গভীর অরণ্য রয়েছে, তারই মাত্র 105 বর্গ কিলো মিটার ক্ষেত্র নিয়ে 1968 সালে স্থাপিত হয়েছিল বান্ধবগড়ের জাতীয় উদ্যান। একদা রেওয়ার মহারাজার শিকারভূমি, এই জাতীয় উদ্যানের বর্তমান আয়তন 500 বর্গ কিলো মিটারের চেয়ে বেশি। এক সময় সাদা বাঘ পাওয়া যেত এখানে। শেষ সাদা বাঘটি বান্ধবগড় থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে রেওয়ার মহারাজা মার্তন্ড সিং-এর হাতে ধরা পড়ে 1951 সালে। এরপর সাদা বাঘের আর কোনো খবর নেই। বর্তমানে বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্প।

বান্ধবগড়ের আরেক গুরুত্ব স্থাপত্যের জন্যে। এখানে আনুমানিক দু'হাজার বছরের পুরোনো একটা দুর্গের ধ্বংসাশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সঠিকভাবে জানা যায়নি — কে-এর নির্মাতা। তবে অনেক রাজবংশ, বেশ কয়েকশো বছর ধরে এখানে বসবাস

বান্ধবগড়ের 2000 বছরেরও বেশী পুরনো দুর্গের মধ্যে মন্দির — যা এই জায়গাকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

করেন। দুর্গের চত্বরে রয়েছে বিশাল লম্বা শোয়ানো একটি বিষ্ণু মূর্তি ও তাঁর মাথার পেছন দিয়ে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি ঝরণা। এখানকার গুহা আর তার গায়ে প্রাচীন সংস্কৃত লিপি এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। এখান থেকে বান্ধবগড়ের উপত্যাকার এক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

বান্ধবগড়ের বুক চিরে চরণগঙ্গা নদী ক্ষীণ ধারায় বয়ে যাচ্ছে। এই নদী এখানকার একমাত্র জলের উৎস।

বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই)-কলকাতা রেলপথে কাটনী পৌঁছে বাসে বা জিপ করে যেতে হবে 32 কিলো মিটার দূরের শহর উমারিয়া-তে। এখানেই বান্ধবগড়ের বনদপ্তরের অফিস। এখান থেকে বান্ধবগড়ের দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটারের মতো। আবার দিল্লি হয়ে উৎকল এক্সপ্রেসে সরাসরি উমারিয়া যাওয়া যায়। নিকটতম বিমান বন্দর খাজুরাহো। বান্ধবগড় জঙ্গলের প্রবেশ দ্বার তালা। কাটনী, উমারিয়া, ও রেওয়া থেকে বাস যাচ্ছে তালা হয়ে। বাসস্টপ থেকে জঙ্গলের প্রবেশপথ মিনিট পাঁচেকের হাঁটা রাস্তা।

বান্ধবগড় জঙ্গলের প্রধান গাছ শাল, বয়ড়া, আমলকী, জাম, কুল, মহুয়া প্রভৃতি। তবে বাঁশ ঝাড়েরই প্রধান্য এখানে। আর আছে এলিফ্যান্ট গ্রাসের সমতলক্ষেত্র। জঙ্গলের রাস্তা কখনো গেছে উঁচু উঁচু ঘাসের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কখনো অন্ধকার করা শাল গাছের বনের ভেতর দিয়ে আবার কখনো দুদিকে খাঁড়াই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে।

বাঘ দেখবার সহজতম সুযোগ বান্ধবগড়। বাঘ ছাড়া ভাল্লুক (Sloth Bear) ও চিতাবাঘও (Leopard) দুষ্প্রাপ্য নয় বান্ধবগড়ে। কখনো কখনো বনবেড়াল ও মেছো বেড়ালও মিলবে এ জঙ্গলে। জঙ্গলের রাস্তায় চিতল ছাড়াও কাকার, সম্বর, নীলগাই, চিঙ্কারা, বনশুয়োর যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। শীতকালে কুল পাকলে হনুমান আর বানরের দল জঙ্গলে সোরগোল ফেলে দেয়। তবে গাউর এখান থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

এ জঙ্গলের আরেক আকর্ষণ পাখি। শীত ও বসন্ত পক্ষী নিরীক্ষকদের জন্যে বান্ধবগড় স্বর্গ। শীতের সব থেকে সরব অতিথি লালমাথা ফুলটুসী (Blossomheaded Parakeet)। বাংলোর কাছাকাছি গাছগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে এদের দেখা পাওয়া যায়। এছাড়া সাদা কাঁক (Grey Heron) কায়েম পাখি (Purple Moorhen), মালাবার ধনেশ (Malabar Hornbill), মদনটাক (Lesser Adjutant Stork), হক্ ঈগল, সারপ্যান্ট ঈগল, ক্রেসটেড ঈগল, মৌ বাজ (Honey Bnzzand) প্রভৃতি দেখা যায়। আট কিলো মিটার দূরের ভদ্রশিলার জলাশয়ে শীতকালে উড়ে আসে নাকটা (Comb Duck), চখ চখি (Rubby Shelduck)।

ভোরে জঙ্গল ঢোকার জন্যে বনদপ্তরের এবং পর্যটক বিভাগের জিপ পাওয়া যায় এবং বিকালে হাতি পাওয়া যায়। বান্ধবগড়ে বন্যপ্রাণী দেখবার শ্রেষ্ঠ সময় মার্চ থেকে মে। তবে শীতকালে পাখির আগমন হয় বেশি।

শীতের ভোরে তাপমাত্রা প্রায় শূন্য ডিগ্রিতে নেমে আসে। গরমকালে বেশ গরম।

বান্ধবগড়ে আসবার জন্য মধ্যপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের হোয়াইট টাইগার লজ রয়েছে। বনবিভাগেরও বাংলো আছে। জঙ্গলের ঠিক বাইরে হাইওয়ের উপর আছে বিলাসবহুল মহারাজা লজ এবং পি.ডব্লু.ডি.-র বাংলো। এছাড়া ছোট বড় অনেক হোটেল আছে। হোয়াইট টাইগার লজে বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে, এম.পি.এস.টি.ডি.সি., চিত্রকুট বিল্ডিং, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা।

আচানকমার অভয়ারণ্য

বিলাসপুর শহরের মাইল কয়েকের মধ্যে, রায়পুরের 172 কিলো মিটার দূরে বিরাজ করছে শাল আর বাঁশের এক গহন অরণ্য। 1975 সালে এই অরণ্যভূমির 551 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে ঘোষিত হয় আচানকমার অভয়ারণ্য।

এই জঙ্গলে বাঘ, হায়না, গাউর, চিতাবাঘ, নীলগাই প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।

পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফুলটুসী (Blossom Headed), ছোট ধনেশ (Grey Hornbill), হরিয়াল (Green Pigeon), বালিহাঁস (Cotton Teal), বড়দিঘর (Pintail) প্রভৃতি ভিড় জমায়।

মার্চ থেকে জুন এখানে আসবার শ্রেষ্ঠ সময়।

আসবার জন্যে আচানকমারে পাঁচটি রেস্ট হাউস আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা — ডি. এফ. ও., আচানকমার অভয়ারণ্য, পো: কারগি রোড, বিলাসপুর, এম. পি.।

পান্না ব্যাঘ্র প্রকল্প

মধ্যপ্রদেশের পান্না ও ছাতারপুর — এই দুই জেলাকে কার্যত ভাগ করেছে কেন নদী। কেন যমুনার উপনদী। কেন নদীর দু'পাড় বরাবর রয়েছে এক গভীর বনভূমি। এই বনভূমির 543 বর্গ কিলো মিটার জায়গা নিয়ে 1981 সালে স্থাপিত হয় পান্না জাতীয় উদ্যান। জাতীয় উদ্যানের দুই তৃতীয়াংশ পান্না জেলায় এবং এক তৃতীয়াংশ ছাতারপুর জেলার অন্তর্গত।

স্বাধীনতার আগে এই বনভূমি ছিল পান্নার রাজার ব্যক্তিগত শিকারভূমি। তখন এই অরণ্যভূমিতে শিকারের অনেক বিধিনিষেধ ছিল। পান্নার নাবালক শাসকের অভিভাবক মেজর হুগো এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বে-আইনি শিকারের উপর নানান রকম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। পরে স্বাধীনতার সাথে, সাথেই এইসব নিষেধাজ্ঞার আর কোনো মূল্য রইল না এবং শুরু হল যথেচ্ছভাবে বন্যপ্রাণী ও পাখির নিধন। বন কেটে পরিষ্কার হতে লাগল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচলিত হয়ে তদানীন্তন বিন্ধ্য প্রদেশের মুখ্য বনপাল 307 বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়ে এক অভয়ারণ্য ঘোষণা করেন 1953 সালে। পরবর্তীকালে এই অভয়ারণ্যকে নামকরণ করা হয়,

গংগৌ অভয়ারণ্য, বর্তমানে যা পান্না জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত। এই জঙ্গলকে 1996 সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কলকাতা বম্বে (মুম্বাই) রেলপথে গেলে সাতনা হল পান্না জাতীয় উদ্যানের নিকটতম রেল স্টেশন। সাতনা থেকে খাজুরাহো যেই সমস্ত বাস যাচ্ছে সেগুলো পান্না হয়ে যায়। এই বাসপথে পান্না শহরে নেমে পড়তে হবে। এখানেই জঙ্গলের ডাইরেক্টারের সদর দপ্তর। আর সড়ক পথে কলকাতা থেকে বেনারস হয়ে সাতনা — সেখান থেকে পান্না। নিকটতম বিমানবন্দর খাজুরাহো।

এই জঙ্গলের প্রধান সমস্যা গোচারণ। প্রতিদিন এক লক্ষেরও বেশি গবাদি পশু এই বনভূমিতে চরতে আসে। বহু বছর ধরে এই গোচারণের ফলে মাটি পরিণত হয়েছে পাথরে, ঘাসের জমিতে জন্মাচ্ছে গুল্ম। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন জঙ্গলের মধ্যে যে 19টি গ্রাম রয়েছে সেগুলিকে পার্কের বাইরে স্থানান্তরিত করতে। নতুন পার্ক, সুতরাং এর উন্নতির জন্যে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বর্তমানে এই জঙ্গলের রূপ বদলেছে। জঙ্গল আবার সবুজ হয়ে উঠেছে।

পান্নার জঙ্গলে যে সমস্ত গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তা প্রধানত শাল, সেগুন, খয়ের, বহেড়া, হরিতকী, আমলকী, জাম প্রভৃতি। এছাড়া আছে কাঁটা গাছ বা গুল্মের ঝোপ। জঙ্গলের ভেতরে ঘাসের সমতলভূমির ভেতর দিয়ে রাস্তা গিয়ে পড়েছে ঘন অরণ্যের মধ্যে। কোথাও বা রাস্তা পৌঁচেছে কেন নদীর গভীর খাঁড়ির সামানাসামনি আবার কোথাও রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের মালভূমিতে। কেন নদীর বুকে পড়ে থাকা বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো হরিদ্বারের গঙ্গার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। জঙ্গল জুড়ে অসংখ্য ঝরণা আছে — পান্ডব, কামাসন ইত্যাদি। বর্ষার পর এইসব ঝরণায় দৃশ্য অপরূপ হয়ে ওঠে।

পান্না গর্ব করতে পারে তার বন্যপ্রাণীর জন্যে। অবলুপ্ত চিতার শেষ হয়ে আসা আরেক প্রজাতি ক্যারাকাল (Caracal) সম্ভবত একমাত্র এখানেই দেখা যেতে পারে। বাঘ, চিতাবাঘ, চিঙ্কারা, বেজী, শেয়াল, হায়না, বনশুয়োর, চিতল, চিঙ্কারা ও হনুমান ছাড়াও এখানে সন্ধান মেলে কৃষ্ণসার, চৌশিঙ্গা, শ্লথ ভাল্লুক আর বনকুকুরের।

সম্ভবত পান্নার জঙ্গলেই সর্বাধিক সংখ্যায় দুধরাজ (Paradise Flycatcher) আছে। এই পাখিটি মধ্যপ্রদেশের পাখি। এছাড়া নানান জাতের ফ্লাইক্যাচার ও ওয়ার্বলার, ময়ূর, বনমুরগি ধনেশ প্রভৃতির দেখা এখানে পাওয়া যায়। কেন নদীর চরে শীতকালে রাজহাঁস (Greylag Goose), রাঙামুড়ি (Common Pochard), সরাল (Lesser Whistling Teal) প্রভৃতির ঝাঁক দেখা যায়।

এখানে পর্যটনের ব্যবস্থা ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। জঙ্গলে ঢোকবার জন্যে জিপ ভাড়া করতে হয় পান্না শহর থেকে অথবা খাজুরাহো থেকে। এখান থেকে খাজুরাহোর দূরত্ব 25 কিলো মিটার। জঙ্গলে বন-দপ্তরের দুটি হাতি আছে। হাতি করে জঙ্গলে ঘোরবার অনুমতি

পাওয়া যায় পান্নায় ডাইরেকটারের কাছ থেকে। হাতির পিঠে বসে, অভিজ্ঞ মাহুতের কাছ থেকে শোনা যায় তার জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জঙ্গলের মতোই এখানে শীত ও গ্রীষ্ম, উভয়ই খুব প্রখর। শীতের ভোরে আর রাতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। আর গরমকালে বেশ গরম। জাতীয় উদ্যান বন্ধ থাকে, জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। এখানে বন্যপ্রাণী দেখবার জন্যে আসতে হয় মার্চ থেকে মে মাসে।

থাকবার জন্যে সাতনা—ঝাঁসী জাতীয় সড়কের উপর জঙ্গলের প্রবেশ পথে হিনোতায় ফরেস্ট বাংলো আছে। এখানে দুটি ঘরে চারটি শয্যা আছে। এছাড়া হিনোতা থেকে 20 কিলো মিটার দূরে মান্ডলাতে পি.ডব্লু.ডি-এর বাংলো আছে, কেন নদীর পাড়ে। এখান থেকে কেন নদীর এক মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। খাবার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। খাবার নিয়ে গেলে ওই দু'জায়গাতেই রাঁধবার ব্যবস্থা আছে।

ডাইরেকটর, পান্না জাতীয় উদ্যান, পান্না, মধ্যপ্রদেশের মাধ্যমে থাকবার ব্যবস্থা করা যায়।

ইন্দ্রাবতী টাইগার রিজার্ভ

বস্তারের জেলা-শহর জগদলপুরের 30 কিলো মিটার দূরে সুবিশাল যে বনভূমি রয়েছে, তারই 2791 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে 1978 সালে ঘোষিত হয়েছিল এই জাতীয় উদ্যান। 1983 সালে এ জঙ্গলকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

নিকটতম শহর ও রেল স্টেশন জগ্‌দলপুর থেকে বাসে অথবা গাড়িতে বিজাপুরে এসে অনুমতিপত্র নিতে হবে বন-দপ্তর থেকে। কিন্তু নিজস্ব জিপ না থাকলে জঙ্গলে ঢোকা যাবে না, কারণ বন-দপ্তরের কোন জিপ পাওয়া যায় না।

সুবিশাল এই জাতীয় উদ্যানের এক অংশ ঢুকে গেছে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে, একাংশ গেছে উত্তর অন্ধ্রে আর বাকিটা রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায়। সেগুন ও মিশ্র পর্ণমোচী এই জঙ্গলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে বাঁশের ঝাঁড়। জঙ্গলের ভেতর বিশাল, বিশাল ঘাসের জমিও চোখে পড়ে। এই জঙ্গলের ভেতর বাস করে অনেক আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান হল মারওয়া।

ইন্দ্রাবর্তী বিখ্যাত বুনো মোষের জন্যে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বাইরে এই জঙ্গলই বুনো মোষের শেষ আস্তানা। যদিও ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীনে এই জঙ্গল, তবু বাঘের সংখ্যা এখানে খুব বেশি নয়। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে আছে গাউর, চিতল প্রভৃতি। ভেতরে রয়েছে এক সুবিশাল ঝিল। এই ঝিলের জলে শীতে উড়ে আসে অ্যাভোসেট (Avocet), স্নাইপ (Snipe), নানা জাতের হাঁস প্রভৃতি; গাছে দেখা যায় টিয়া, ফিঙে, বুলবুলি, দোয়েল প্রভৃতি পাখির ঝাঁক।

এখানে থাকবার কোনো রেস্ট হাউস নেই। তবে কুটরুতে জঙ্গলের কর্মচারীদের জন্যে একটা ছোট বাংলো আছে। জগদ্‌লপুরের বনপালের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে এখানে থাকা যায়। খাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিজেকে করতে হয়।

ডাইরেক্টর, ইন্দ্রীবতী টাইগার রিজার্ভ, বিজাপুর, বস্তার, মধ্যপ্রদেশকে অনুমতির জন্য যোগাযোগ করতে হবে।

চম্বল অভয়ারণ্য

গোয়ালিয়র শহর থেকে 65 কিলো মিটার দূরে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু বনভূমি নিয়ে 1973 সালে 3902 বর্গ কিলো মিটার জায়গা জুড়ে এই অভয়ারণ্য স্থাপিত হয়। এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত চম্বল নদী তিনরাজ্যের মধ্যে সীমানা সৃষ্টি করেছে। অরণ্যভূমির মাঝে মাঝে রয়েছে চম্বল বেহড়। এই অভয়ারণ্য তৈরি হয়েছিল প্রধানত ঘড়িয়ালকে রক্ষা করবার জন্যে।

নভেম্বর থেকে মার্চ এখানে আসবার পক্ষে উপযুক্ত সময়। থাকবার জন্য এখানে একটি রেস্ট হাউস আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা — প্রজেক্ট অফিসার, জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্য, পো : II মোরেনা, মধ্যপ্রদেশ।

সাতপুরা জাতীয় উদ্যান

পাঁচমারীর কাছেই 524 বর্গ কিলো মিটার বনভূমিকে নিয়ে 1983 সালে স্থাপিত হয় সাতপুরা জাতীয় উদ্যান। শাল, সেগুনের মিশ্র এই জঙ্গলে রয়েছে বাঘ, চিতল, সম্বর. গাউর প্রভৃতি। এই জঙ্গলের উচ্চতম স্থানের উচ্চতা 1362 মিটার।

মুম্বাই-হাওড়ার এলাহাবাদ শাখার স্টেশন পিপারিয়াতে নেমে জিপ বা বাসে এখানে আসতে হয়।

থাকতে হবে এক কিলো মিটার দূরের পাঁচমারীতেই। কলকাতায় এম.পি.এস.টি.ডি.সি. থেকে পাঁচমারীর জন্য বুকিং করা যায়।

সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান

মধ্য প্রদেশের সিধি জেলায় 1981 সালে স্থাপিত হয়েছিল সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান। বর্তমানে এই জঙ্গলের আয়তন 1938 বর্গ কিলো মিটার। অতীতে এর নাম ছিল 'দুবারি' অভয়ারণ্য। প্রধানত শালের এই জঙ্গলটি ভরে আছে অনেক প্রজাতির বন্যপ্রাণীতে। অবশ্য এর ভেতরে রাস্তা তেমন না থাকায় জঙ্গলে ঘোরবার খুব অসুবিধা। এখানে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, চিতল, সম্বর, বুনোশুয়োর, নীলগাই প্রভৃতি প্রাণী। তবে চিতল আর বুনো শুয়োর ছাড়া আর প্রায় কোনো প্রাণীর দেখা সচরাচর মেলে না।

থাকবার জন্য এখানে আছে একটি ফরেস্ট রেস্ট হাউস। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে এখানে বেড়াবার পক্ষে উপযুক্ত সময়।

যোগাযোগের ঠিকানা, ডাইরেক্টার, সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান ও সিধি, মধ্যপ্রদেশ।

পাঁচমারী অভয়ারণ্য

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে সুন্দরী পাঁচমারী। বুনো আম, জাম, শাল আর বাঁশ ঝাড়ে ঘেরা এই পাহাড় বিরাজ করে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি। ঝরণার ঝর্‌ঝর ধারা আর অশান্ত পাহাড়ি নদীর কূলকুল শব্দের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় কেশরাজ, শ্যামা আর দোয়েলের কলতান। বাবুনাই (White Eye), হরেওয়া (Chloropsis), দামা (Ground Thrush), হাজারিকা (Scarlet Minivet), দুর্গা টুনটুনি (Purple Sunbird) প্রভৃতি অসংখ্য প্রজাতির পাখির দেখা মেলে পাঁচমারীতে। পাহাড়ের গভীর খাদের উপর রাজকীয় ভঙ্গিতে ভেসে বেড়ায় ফ্যাল্‌কান, হক্‌ আর ঈগলেরা। আর বন্যপ্রাণীর মধ্যে দেখা মেলে সাধারণ হনুমান, সম্বর, গাউর, কাকার হরিণ ও শ্লথ ভাল্লুকের।

পাঁচমারীর নিকটতম রেল স্টেশান মুম্বাই-হাওড়া লাইনের 47 কিলো মিটার দূরের পিপারিয়াতে। এখান থেকে নিয়মিত বাস ও মিনিবাস যায় পাঁচমারীতে। ট্যাক্সিও পাওয়া যায় অজস্র।

থাকবার জন্য এখানে বিভিন্ন দামে সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে। মধ্যপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের — সাতপুরা রিট্রিট আমালতাস হলিডে হোম, পঞ্চবটী কটেজ প্রভৃতিতে দুই শয্যার ঘর পাওয়া যায়। এছাড়া পি. ডব্লু. ডি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হোটেলও আছে।

কারেরা পাখিরালয়

শিবপুরী — ঝাঁসির রাস্তায় শিবপুরী থেকে 80 কিলো মিটার দূরে পড়বে এই অভয়ারণ্য। 1981 সালে মাত্র 202 বর্গ কিলো মিটার জায়গা নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল এই অভয়ারণ্য মুখ্যত অবলুপ্তপ্রায় তুতুর (Great Indian Bustard) রক্ষা করবার জন্য। রাজস্থান সীমানার নিকটবর্তী এই জঙ্গলে অল্প কিছু শাল, খয়ের ছাড়া আছে গুল্ম আর ল্যান্টানার ঝোপ। এখানকার প্রধান আকর্ষণ তুতুরের দেখা পাওয়া যায় এপ্রিল থেকে মে মাসে। জঙ্গলের মাঝে ঝিল রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রকমের জলের পাখি, এমনকী ফ্লেমিংগোও দেখা যায়। লাল বনমুরগি এখানে প্রচুর। পাখি ছাড়া আছে নেকড়ে, শেয়াল, চিঙ্কারা প্রভৃতি বন্যপ্রাণী।

এখানে আসার জন্যে ঝাঁসি থেকে জিপ ভাড়া করাই শ্রেয়।

থাকবার জন্য কারেরাতে একটি গেস্ট হাউস আছে। তবে খাবারের ব্যবস্থা নেই।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :—

ফরেস্ট অফিসার, কারেরা বার্ড অভয়ারণ্য, পো: কারেরা, মধ্যপ্রদেশ।

শিবপুরী বা মাধব জাতীয় উদ্যান

আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী 1584 খ্রিস্টাব্দে মালওরা থেকে ফেরবার পথে বাদশা আকবর বন্যহাতির এক বিশাল দলকে ধরেছিলেন শিবপুরী বা শিক্রি-র জঙ্গল থেকে। অবশ্য এখন আর হাতির অস্তিত্ব নেই এই জঙ্গলে। এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক থেকে এই মহারাজাদের এক নাগাড়ে বাঘ মারার ফলে, হাতির মতো বাঘও লোপ পেয়েছে এখানে থেকে। স্বাধীনতার পর যখন মহারাজাদের আওতার বাইরে চলে গেল এই জঙ্গল, তখনই শুরু হল অরণ্যজুড়ে শিকারের তাণ্ডব। একটির পর একটি বন্যপ্রাণী ও পাখির প্রজাতি লুপ্ত হতে থাকল শিবপুরী থেকে। অবশেষে 1958 সালে শিবপুরীকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হল, মাধব নাম দিয়ে 156 বর্গ কিলো মিটার জায়গা নিয়ে।

শিবপুরীর নিকটতম রেলস্টেশন ও বিমানবন্দর 108 কিলো মিটার দূরে অবস্থিত গোয়ালিয়র শহরে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, ঝাঁসি প্রভৃতি শহরের সঙ্গে শিবপুরীর সরাসরি যোগাযোগ আছে। বম্বে-আগ্রা-র 3নং জাতীয় সড়ক চলে গেছে উদ্যান থেকে দূরে শিবপুরী শহরের ভেতর দিয়ে।

দেড়শো বর্গ কিলোমিটার এই জাতীয় উদ্যানের গড় উচ্চতা 360 থেকে 480 মিটারের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় ও উচ্চভূমি রয়েছে। মিশ্র পর্ণমোচী এই জঙ্গলের প্রধান গাছপালাগুলির মধ্যে আছে খয়ের ইত্যাদি। জঙ্গলের মধ্যে একটি কৃত্রিম লেক রয়েছে — চাঁদপাতা। এখানকার দৃশ্য বেশ সুন্দর।

শিবপুরী জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সব থেকে বড় বাসিন্দা হ'ল চিতল হরিণ। এখানকার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ চিঙ্কারা হরিণ। এখানে অল্প সংখ্যক কৃষ্ণসার হরিণ ও নীলগাই আছে। তাছাড়া বুনো শুয়োর, সম্বর, শ্লথ ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বনবেড়াল প্রভৃতি।

শীতকালে চাঁদপাতার জলে উড়ে আসে রাজহাঁস (Greylay Goose), বড়দিঘর (Pintail), উইজিয়ান সরাল (Lesser Whistling Teal) আর আছে খঞ্জন (Wagtail), দোয়েল (Magpic Robin), সিপাহী বুলবুল (Red Whiskcared Bulbul), হট্টিটি (Redwattled Lapwing), সোনাজাং (Painted Stork), কাস্তেচরা (White Ibis), খুন্তেবক (Spoonbill) প্রভৃতি পাখি।

শিবপুরী জাতীয় উদ্যান সারা বছরই খোলা থাকে পর্যটকদের জন্য এবং ডিসেম্বর থেকে মে মাস বেড়াবার জন্য উপযুক্ত সময়। পর্যটন বিভাগের জিপে করে জঙ্গলে

ঘোরার ব্যবস্থা আছে। জিপ ভাড়া প্রতি কিলো মিটারের জন্য 20 টাকা। এছাড়া মিনিবাস ও ট্রেকার আছে। চাঁদপাতা লেকে ঘোরাবার জন্যে পায়ে চালান বোটের ব্যবস্থা আছে বেশ সুলভ মূল্যে। বোটে বেড়াতে বেড়াতেও বন্যপ্রাণীর দর্শন মেলে।

মধ্যপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের যত বাংলো আছে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত শিবপুরীতে। চিঙ্কারা হোটেলে দ্বিশয্যার ঘরে পাওয়া যাবে তারা হোটেলের সুখ।

চিঙ্কারা হোটেলেই খাবার বন্দোবস্ত আছে। দেশি, বিদেশি সব ধরনের খাবারই মিলবে কিঞ্চিৎ চড়া মূল্যে। যোগাযোগের ঠিকানা, কলকাতার এম.পি.এস.টি.ডি.সি., চিত্রকুট বিল্ডিং, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা

পেঞ্চ ব্যাঘ্র প্রকল্প

সিতনী — নাগপুর সড়কের উপর নাগপুর থেকে প্রায় 70 কিলো মিটার দূরে পড়ে পেঞ্চ ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রবেশদ্বার। নিকটতম রেল স্টেশন ও বিমানবন্দর নাগপুর থেকে পেঞ্চে আসবার জন্য গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান ও ব্যাঘ্র প্রকল্প। শাল, মহুয়া, জাম, আমলকীতে ভরা এই জঙ্গলে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভল্লুক, সম্বর, চিতল হরিণ, নীলগাই, কাকার হরিণ, বনশুয়োর প্রভৃতি বন্যপ্রাণী। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে চলেছে পেঞ্চ নদী। বড় বড় পাথরে ভরা এই নদীর নীল জলে শীতকালে পরিযায়ী হাঁসেরা খেলে বেড়ায়। পরিযায়ী হাঁসের মধ্যে এখানে পাওয়া যায় সরাল,

পেঞ্চ নদীর নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশে একজোড়া মানিকজোড়।

গ্যাডওয়াল (Gad wall), চখাচখি প্রভৃতি। সারা বছরই মাণিকজোড় (white necked stork) এর দেখা পাওয়া যায়।

জঙ্গলে ঘোরবার জন্যে নিজেদের গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। জঙ্গলের মধ্যে গাড়িতে ঘোরবার মত ভাল রাস্তা রয়েছে। থাকবার জন্যেও ভাল বন্দোবস্ত আছে এখানে। বেশ কয়েকটি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট্য কটেজ ও বনবিশ্রাম গৃহ আছে।

এখানে আসবার জন্য আবেদন করতে হবে, ফিল্ড ডিরেক্টর, প্রোজেক্ট টাইগার, পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ, সিওনী, মধ্যপ্রদেশের কাছে।

রাজস্থান

সারিস্কা জাতীয় উদ্যান

আরাবল্লী পর্বত উপত্যকায়, দিল্লি-জয়পুর সড়কের কাছে রয়েছে এই সুন্দর জাতীয় উদ্যানটি। আলোয়ারের রাজ পরিবারের নিজস্ব এই শিকার ভূমিটি 1985 সালে অভয়ারণ্য এবং 1982 সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা লাভ করে। 800 বর্গ কিলোমিটারের এই জঙ্গলটি 1979 সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আসে।

জয়পুর থেকে 143 কিলো মিটার, আলোয়ার থেকে 39 কিলো মিটার ও দিল্লি থেকে 200 কিলো মিটার দূরে এই জঙ্গলে প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর বাস যাচ্ছে দিল্লি-জয়পুর রুটে, আলোয়ার থেকেও বাস যাচ্ছে প্রতি ঘন্টায়।

আরাবল্লী পর্বতমালার উপত্যকায় অবস্থিত এই জঙ্গলটি ছবির মতো সুন্দর। এর ভূ-প্রকৃতি মাঝে মাঝে মরুভূমি প্রায়। অতি শুষ্ক মিশ্র পর্ণমচীর এই জঙ্গলটির ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ঘাসের জমি এবং কতকগুলি জলাধার। জলাশয়গুলির ধারে, 15 মিটার উচ্চতায় আছে দুটি ওয়াচ-টাওয়ার। প্রধানত গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার মুখে এই নজর মিনার থেকে নানা ধরনের বন্যজন্তুর দেখা মেলে। সারিস্কাতে মধ্যযুগের কিছু ইতিহাসের সন্ধান মেলে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর নীলকণ্ঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে 32 কিলোমিটার দূরে, এখনো এখানে পূজা হয়। এছাড়া রয়েছে পাহাড়ের মাথায় সপ্তদশ শতকের কঙ্কয়ারী দুর্গ।

সারিস্কায় শেষ ব্যাঘ্র গণনায় 35 টি বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এখানকার বাঘ রন্থাম্ভোরের মতো দিনের বেলায় খোলা জায়গায় বেরোয় না। বাঘ, চিতাবাঘ, বনবেড়াল, খরগোস ছাড়াও সারিস্কায় 1985 গণনায় 3 টি ক্যারাকালের (Caracal) সন্ধান মেলে। 1986-তে এখানে প্রথম বুনো কুকুর বা ঢোল দেখা যায়। ঘাসের জমিগুলিতে ও সকালে-সন্ধ্যায় জলাশয়গুলিতে নীলগাই, চিতল, চিঙ্কারা, চৌশিঙ্গা প্রভৃতির দেখা মেলে।

পাখির মধ্যে দেখা যায় — ময়ূর, লাল বনমোরগ, তিতির, বটের, বোনেলী ঈগল প্রভৃতি।

এই জঙ্গলে হাতি করে ঢোকার কোনও বন্দেবস্ত নাই। বনবিভাগের 10 সিটের মিনিবাস পর্যটকদের জঙ্গলে নিয়ে যায়। জঙ্গল দেখার শ্রেষ্ঠ সময় ভোরবেলা এবং সূর্যাস্তের ঠিক আগে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন বন্যপ্রাণী দেখার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়।

থাকবার জন্য পাশ্চাত্য প্রথায় রয়েছে 'হোটেল সারিস্কা প্যালেস'।

রাজস্থানে পর্যটন বিভাগের পরিচালনায় রয়েছে টাইগার ডেন ট্যুরিস্ট বাংলো। এখানে বাতানুকুল ঘরেরও ব্যবস্থা আছে।

খাবার জন্য ক্যান্টিন আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা, ট্যুরিস্ট অফিসার, 'টাইগার ডেন ট্যুরিস্ট বাংলো, সারিস্কা'।

কেওলাদেও ঘানা জাতীয় উদ্যান

দিল্লি থেকে 176 কিলো মিটার এবং আগ্রার 50 কিলো মিটার দূরে এই জলাজঙ্গলটিতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই পাখিরালয়টি রয়েছে। এখানে বছরে 12,000 পাখির বাসায় 30,000 হাজারেরও বেশি পাখির বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ভরতপুরের মহারাজা ভরতপুর শহরের এক কিলো মিটার দূরে এই জঙ্গলটিকে পাখিদের বসবাসের আদর্শভূমিতে পরিণত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই নিচু জলা-জঙ্গলটিকে দেশের শ্রেষ্ঠ হাঁস ও বনমুরগি শিকারের অঞ্চল করে গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে মহারাজা এত সফল হয়েছিলেন যে ভরতপুর পার্কের ভেতরে এখনো একটি ফলকে লেখা আছে তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকেরা ও দেশীয় রাজারা কবে কত পাখি শিকার করেছিলেন। এত যথেচ্ছ শিকার সত্ত্বেও কিন্তু এই জলাভূমিটি ক্রমশই সমৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাজার, হাজার পাখির আবাসস্থলে পরিণত হয়। 1981 সালে এই জায়গাটিকে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করা হয়, কেওলাদেও ঘানা জাতীয় উদ্যান নাম দিয়ে।

দিল্লি ও আগ্রা থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে ভরতপুরে। দিল্লী থেকে সময় সাড়ে তিন ঘন্টার মতো। তাছাড়া দিল্লি, আগ্রা এবং ভরতপুরের মধ্যে কয়েকটি ট্রেন যাতায়াত করে।

বাবলা, খেজুর, কুল প্রভৃতি গাছ সমেত এখানে প্রায় সোয়া দু'শো জাতের উদ্ভিদের সন্ধান মেলে। জলাভূমিতে বেশ কয়েক রকম ঘাস, লতা, আগাছা পাওয়া যায়, যা আকর্ষণ করে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের। জলাভূমি ছাড়াও ভরতপুরে রয়েছে জঙ্গল। এই জঙ্গলে বেশ কয়েক রকম বন্যপ্রাণীরও দেখা মেলে।

ভরতপুরের এই জাতীয় উদ্যান পক্ষীপ্রেমিকদের কাছে স্বর্গ। এই 29 বর্গ কিলো মিটার জলাভূমিতে 56 পরিবারের 350 প্রজাতির পাখির আগমন হয়। প্রতি বছর প্রায় 10 হাজার এর উপর বাসা বানায় সোনাজাং (Painted Stork), কাস্তেচরা (White

কেওলাদেও-এর গাছে বাসা বানাতে ব্যস্ত খুন্তে বক।

Ibis), শামুকখোল (Openbill), নানা জাতের বক (Eagret), হেরন (Heron) ও পানকৌড়ি (Shag) প্রভৃতি। জলের উপরে বাসা বাঁধে জলপায়রা (Moor Hen) এবং জলপিপি (Jacana)। এই সব বাসা বাঁধা পাখিরা প্রায় মাস খানেক-এর মধ্যে 1200 টনের মতো খাবার খায়। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এদের বাসা বাঁধার সময়। নভেম্বর থেকে উড়ে আসতে শুরু করে যাযাবর হাঁসের ঝাঁক। সুদূর চীন এবং মঙ্গোলিয়া থেকে প্রায় 10,000 কুট (Coot) প্রায় 4,500 কিলো মিটার দূর থেকে উড়ে আসে। এছাড়া আসে পাতারিহাঁস (Common Teal), গিরিয়া হাঁস (Garganey), ছোট লালশির (Pochard)। সুদূর সমরখন্দ থেকে আসে খুন্তে হাঁস (Shoveller)। 5,800 কিলোমিটার দূর থেকে এখানে শীতের অতিথি হয় রাফ্ ও রিভ্। বিভিন্ন দেশ ও জায়গা থেকে উড়ে আসে পীং হাঁস (Gadwall), মার্বেলড্ (Marbelled), বালিহাঁস (Cotton teal) ও সরাল (Lesser Whistling Teal), রাজহাঁস (GreyLag) ও বারহেডেড গুজ (Barheaded Goose), নাক্টা (Nakta), নীলশির (Mallard), মেটে হাঁস (Spotbill) প্রভৃতি হাঁসের ঝাঁক। তিন ধরনের গগনবেড় (Pelican) এখানে দেখা যায়, এরা হল — গ্রে (Grey) ডালমেসিয়ান (Dalmatian) ও রোজি পেলিক্যান (Rosy Pelican)।

এখানে যতটা পর্যন্ত ডাঙ্গাভূমি আছে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে লাল ময়না (Rosy Pastor)। মেঘের মতো উড়ে আসে স্প্যানিস-স্প্যারো (Spanish Sparrow)। ছোট পাখিদের মধ্যে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হাজারিকা (Minivet), বান্টিং (Bunting), বগেড়ি (Pipit), রামগাংরা (Tit), কালীশ্যামা (Indian Robin), বিভিন্ন রকম থ্রাস

(Thrush) প্রভৃতি। এছাড়া এখানে দেখা যায় বিভিন্ন জাতের মাছরাঙা, কার্লু, (Curlew), প্লোভার (Plover), হট্টিটি (Lapwing), স্টিপ ঈগল (Steppe Eagle), অসপ্রে (Osprey), মার্শ হ্যারিয়ার (Marsh Harrier), ও পেল হ্যারিয়ার (Pale Harrier), টনি-ঈগল, ক্রেসটেড হক্ ও সার্পেন্ট ঈগল, সাধারণ ও গিন্নী শকুন প্রভৃতি। ভরতপুরের জঙ্গলে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে দেখতে পাওয়া যায় নীল গাই, বন শুয়োর, চিতল হরিণ, বাঁদর, বেজী ভারতীয় ময়াল প্রভৃতি। এখানে আর যে সব প্রজাতির বন্যপ্রাণীর খবর মেলে তারা হল বন বিড়াল, মেছো-বিড়াল, চিতাবাঘ, সম্বর, শেয়াল, খাটাস প্রভৃতি। সম্প্রতি এখানে এক বাঘিণীর পদার্পণ ঘটেছে। এখানকার জলে পাওয়া যায় নানা ধরনের জলজ সাপ, জোঁক, শামুখ, ক্রিল এবং মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা প্রভৃতি। জঙ্গলের প্রবেশ দ্বারে সাইকেল রিক্সা ভাড়া পাওয়া যায় জঙ্গলে ঘোরার জন্য। এই জঙ্গলের ভিতরে পিচের রাস্তা আছে। রিক্সা চালকেরাই গাইডের কাজ করে। তবে এখানে পাখি দেখার শ্রেষ্ঠ উপায় হল জঙ্গলের পুরো এলাকাটাই পায়ে হেঁটে ঘোরা, বিশেষ করে ভোরে আর বিকালে। বিভিন্ন ধরনের স্টর্ক এবং হেরনের বাসা বাঁধা দেখতে হলে আসতে হবে জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। আর যাযাবর পাখির এবং অন্যান্য পাখি দেখার শ্রেষ্ঠ সময় হল ডিসেম্বর-এর শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত।

জঙ্গলের প্রবেশ দ্বারে রয়েছে বিলাস বহুল আই. টি. ডি. সি ফরেস্ট লজ। ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে রয়েছে পর্যটন বিভাগের সারস টুরিস্ট বাংলো, আর আছে জঙ্গলের ঠিক ভিতরে বন দপ্তরের বাংলো শান্তি কুঠি। এছাড়া ভরতপুরে রয়েছে, অসংখ্য ছোট বড় হোটেল।

যোগাযোগের ঠিকানা, ম্যানেজার, সারস বাংলো, ভরতপুর, রাজস্থান।

ডেজার্ট জাতীয় উদ্যান

জয়সলমীরের 32 কিলো মিটার দূরে যে মরুভূমি আছে সেখানে বন্যপ্রাণীর স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। 1980 সালে 3,162 বর্গ কিলো মিটার এই এলাকাটিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। এই মরু অঞ্চলটির খুব কম অংশেই সাহারা বা থরের মতো টানা মরু অঞ্চল। এখানে বালিয়াড়ির ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়বে কাঁটা ঝোপ ও গুল্ম, এমনকি কিছু কিছু গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই মরুভূমি অঞ্চলের কাছাকাছি খোঁজ মেলে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার গাছের জীবাশ্মের। এখানকার সবচেয়ে মনোরম দৃশ্য দেখা যায় সম বালিয়াড়িতে।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে এখানে দেখা মিলবে চিঙ্কারা, মরুভূমির শেয়াল, মরুভূমির বিড়াল, খরগোস, আর বালির গর্তে বসবাসকারী বালু মাছের।

পাখির মধ্যে রয়েছে টনি ঈগল (Tony Eagle), শর্ট টোড্ ঈগল (Short Toed Eagle), স্পটেড টনি ঈগল, কেস্ট্রেল (Kestrel), ল্যাগার ফ্যালকন (Lagar Falcon), স্যান্ডগ্রাউস (Sandgrouse), প্রভৃতি। এছাড়া এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তুতুর (Great Indian Bastard)। বিলুপ্তপ্রায় এই পাখির শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল এই অঞ্চল।

জিপে ও উটের পিঠে এই মরুভূমিতে প্রবেশ করা যায়। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ এখানে বেড়াবার সময়। গরমে তাপমাত্র 50° ডিগ্রি সে: এর উপরে ওঠে।

এখানে বেশ কয়েকটি রেস্ট হাউস আছে। তাছাড়া গ্রামের ভিতর কিছু ঘর ভাড়া পাওয়া যায়।

রন্থাম্ভোর ব্যাঘ্র প্রকল্প

আরাবল্লী ও বিন্ধ্যপর্বতের সংযোগস্থলে যে জঙ্গলটি রয়েছে তার 392 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে রন্থাম্ভোর জাতীয় উদ্যান। 1955 সালে রন্থাম্ভোর প্রথম ঘোষিত হয় অভয়ারণ্য হিসাবে। এই জঙ্গলটিতে রয়েছে ইতিহাস এবং প্রকৃতির সংমিশ্রণ। 1301 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজাদের হাত থেকে রন্থাম্ভোরের ঐতিহাসিক দুর্গটি চলে যায় আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাবাহিনীর হাতে। পরে তিনি রাজা হামীরকে পরাস্ত করেন। তার ফলস্বরূপ রাজপুত মহিলারা এই দূর্গের মধ্যেই আত্মঘাতী হন। কিন্তু এর পরে আবার দুর্গটি

রন্থম্ভোরে জঙ্গল ঘেরা ঐতিহাসিক দূর্গ অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী।

রাজপুতদের দখলে চলে আসে। পরবর্তী যুগে আকবর এই দুর্গটি দখল করেন। আরও পরে মোঘলদের হাত থেকে দুর্গটি চলে আসে জয়পুরের শাসকদের হাতে। 1949 সাল পর্যন্ত এই জঙ্গলটি ছিল জয়পুর শাসকদের সম্পত্তি এবং জয়পুরের মহারাজার ব্যক্তিগত শিকারভূমি। 1972 সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই জঙ্গলটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় চলে আসে।

রন্থাম্ভোর জাতীয় উদ্যানের শহর সাওয়াই মাধোপুর দিল্লি-মুম্বাই রেলপথে অবস্থিত। এই রেলওয়ে স্টেশনটি বেশ জমজমাট। কলকাতার পর্যটকদের জন্য দিল্লি হয়ে ফ্রন্টিয়ার মেলে অথবা দিল্লি দুন এক্সপ্রেসে সওয়াই মাধোপুর স্টেশনে আসাই শ্রেয়। তবে আগ্রা বা জয়পুর থেকেও সওয়াই মাধোপুরের বাস পাওয়া যায়।

জঙ্গলের প্রকৃতি সাধারণভাবে রুক্ষ। প্রধানত কুল, আম, তাল, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি গাছের পাশে পাশে রয়েছে ল্যানটানা ও কাঁটা ঝোপ এবং ঘাসের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। যোগীমহলের সংলগ্ন যে সুবিশাল কৃত্রিম হ্রদটি রয়েছে তা বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী ও পাখির আবাসস্থল। এখানে বাঘ দেখার এত সহজ সম্ভাবনা কেবলমাত্র বান্ধবগড় ও কানহা ছাড়া আর কোথাও নেই। দীর্ঘদীন ধরে সংরক্ষণের ফলে এখানকার বাঘেদের মানুষের প্রতি ভয় প্রায় নেই। এরা দিনের আলোতে প্রায়শই ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং বাঘের ছবি তোলবার জন্য এরকম আদর্শ জঙ্গল আর নেই। কাচিদা ভ্যালি অঞ্চলে বেশ ভাল সংখ্যায় চিতাবাঘ আছে। এছাড়া এখানে রয়েছে হায়না, শেয়াল, বন বেড়াল, শ্লথ ভাল্লুক প্রভৃতি। লাকারদা এবং অনন্তপুরা জায়গা দুটিতে শ্লথ ভাল্লুক প্রায়ই চোখে পড়ে। তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যায় দেখা যায় চিতল হরিণ। যোগীমহলের সংলগ্ন রাজবাঘ লেকের আশে পাশে প্রচুর সম্বর পাওয়া যায়। এছাড়া নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে সাধারণ হনুমান ও বুনো শুয়োর। চিঙ্কারা, বুনো খরগোসও বিরল নয়। লেকে দেখতে পাওয়া যায় কুমীর ও গোসাপ।

বিভিন্ন প্রজাতির পাখিও রয়েছে রন্থাম্ভোর দুধরাজ (Paradise Flycatcher), ঝুঁটি ভরত (Crested Ground Lark), চন্দনা (Alexandrine Parakeet), হাঁড়ি চাচা (Tree pie), ধানি ভুরাই (Field Pipit), বিভিন্ন জাতের ছাতারে (Babblar), ছোট বাটন (Little Ring Plover), কার্লু (Curlew), হট্টিটি (Red wattled Lapwing), ফেজেন্ট টেলড্ জাকানা ও কায়েম পাখি (Purple Moorhen), সোনাজাং (Painted Stork), সারস, গয়ার (Anhinga), কালাজাং (Black Stork), সরাল, বালিহাঁস, বড়দীঘর, পানকৌড়ি (Cormorant) বোনেলিস ঈগল (Boneli's Eagle) প্রভৃতি যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় এই জঙ্গলে।

অক্টোবর থেকে এপ্রিল এ জঙ্গলে আসার ভাল সময়। জঙ্গল খোলা থাকে জুন মাস পর্যন্ত। জঙ্গলে প্রবেশ করবার জন্যে বনবিভাগের জিপ পাওয়া যায় সাওয়াই মাধোপুরে।

সাওয়াই মাধোপুরে অনেক প্রাইভেট জিপেরও ব্যবস্থা আছে। শহর থেকে উদ্যাম দেখিয়ে শহরে ফিরতে শ' পাঁচেক টাকা জিপ ভাড়া লাগে। জঙ্গলের প্রবেশ দ্বারেও জিপ ভাড়া পাওয়া যায়। ভোর ছ'টা থেকে সকাল দশটা এবং বিকেল তিনটে থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত জঙ্গলের গেট খোলা থাকে পর্যটকদের জন্যে।

জঙ্গলের মধ্যে লেকের পাড়ে আছে যোগীমহল। এক সময় এই যোগীমহলের ছাদে বসেই বাঘ থেকে কুমীর পর্যন্ত সমস্ত রকম বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন এখানে প্রবেশ নিষেধ। এখানে থাকার অনেক হোটেল আছে। জঙ্গলের ঠিক বাইরেই আছে ঝুমার বাওরি। এছাড়া সাওয়াই মাধোপুর-এ আছে অসংখ্য ছোট বড় হোটেল।

ক্যাসেল ঝুমাব বাউরি বুক করবার জন্যে লিখতে হবে ---

ফিল্ড ডিরেক্টর, রন্থম্ভোর এন. পি., সহাই মাধুপুর অথবা দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি বড় শহরের রাজস্থান রাজ্য পর্যটন বিভাগ থেকেও বুক করার ব্যবস্থা আছে।

ন্যাশনাল চম্বল অভয়ারণ্য

চম্বল নদীর পাড় বরাবর রাণা প্রতাপ সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনার সংযোগস্থল পর্যন্ত 589 বর্গ কিলো মিটার এলাকা নিয়ে 1983 সালে স্থাপিত হয় ন্যাশনাল চম্বল অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্যে, নিকটতম শহর কোটা থেকে আসা যায়।

কৃষ্ণসার হরিণ, চিঙ্কারা, কারাকাল, নেকড়ে প্রভৃতি বন্যপ্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় এই অভয়ারণ্যে। শীতকালে প্রায়শই কুমীরও দেখা যায় নদীর চরে।

ঘোরবার জন্যে কোটা থেকে নৌকা ভাড়া করা যায়।

অক্টোবর থেকে মার্চ এখানে আসবার প্রকৃষ্ট সময়

কোটা শহরে থাকবার অনেক সুব্যবস্থা আছে

সীতামাতা অভয়ারণ্য

রাজস্থানের দক্ষিণ দিকে বিরাজ করছে পর্ণমোচী ও বাঁশের এক গভীর জঙ্গল। উদয়পুর শহরের 208 কিলো মিটার দূরের এই বনভূমির 123 বর্গ কিলো মিটার এলাকা নিয়ে 1979 সালে ঘোষিত হয় সীতামাতা অভয়ারণ্য। উদয়পুর থেকে বাসে এখানে আসা যায়।

এই জঙ্গলের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আছে চিতাবাঘ, ক্যারাকাল, চৌশিঙ্গা, সম্বর, চিঙ্কারা, বুনোশুয়োর প্রভৃতি। বনবরুই ও ভাম-এর সন্ধানও এখানে পাওয়া যায়।

এখানকার ফরেস্ট রেস্ট হাউসে থাকবার জন্য বন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। যোগাযোগের ঠিকানা, ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন, সীতামাতা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, ধারিয়াওয়াদ, উদয়পুর।

দারা অভয়ারণ্য

কোটা শহরের 50 কিলো মিটার দূরত্বে 266 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে 1955 সালে জন্ম নিয়েছিল দারা অভয়ারণ্য। দারা এক সময় ছিল কোটার রাজার ব্যক্তিগত শিকারের জন্য সংরক্ষিত অরণ্য। এখানে রয়েছে নেকড়ে, শ্লথ ভাল্লুক, চিঙ্কারা, চিতাবাঘ প্রভৃতি বন্যজন্তু। ফেব্রুয়ারি থেকে মে, এখানে বেড়াবার পক্ষে অনুকূল। দারাতে একটি রেস্ট হাউস আছে। রেঞ্জ অফিসার দারার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

মাউন্ট আবু অভয়ারণ্য

আবু রোড স্টেশনের 28 কিলো মিটার দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে মাউন্ট আবু অভয়ারণ্য। এই জঙ্গলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছিল 1960 সালে। বর্তমানে এর আয়তন 289 বর্গ কিলো মিটার। উত্তর-পূর্ব মাউন্ট আবুর এই পাহাড়ি জঙ্গলে আছে শ্লথ ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, চিঙ্কারা প্রভৃতি বন্যপ্রাণী। এছাড়া আছে অনেক চিত্তাকর্ষক পাখি।

এখানে বেড়াবার জন্যে ভাল সময় মার্চ থেকে জুন। মাউন্ট আবু শহর থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে। এই জঙ্গলে ভ্রমণার্থীরা থাকতেও পারেন। রাজস্থান পর্যটক বিভাগের শিখর টুরিস্ট বাংলোতে থাকার সুবন্দোবস্ত আছে।

প্রবেশের জন্যে অনুমতি নিতে হয় মাউন্ট আবুর ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন-এর কাছ থেকে।

সিকিম

কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান

1977 সালে 850 বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে এই জাতীয় উদ্যান সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে। এই জাতীয় উদ্যানের নীচের দিকে আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি বনভূমি আর উপরের দিকে আছে অ্যালপাইন বন আর তারও উপরে বরফ ঢাকা। পশ্চিমে

নেপাল ও বেশ কয়েকটি পৃথিবী বিখ্যাত পর্বত চূড়া নিয়ে এ জাতীয় উদ্যানের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। উত্তরে রয়েছে জেমু হিমবাহ, যেটি জেমু নদী ও পরে তিস্তা নদীতে পড়েছে। জাতীয় উদ্যানে বহু বিপন্ন বন্যপ্রাণী রয়েছে যথা চিতাবাঘ, আমচিতা, তুষারচিতা, হিমালয়ের টার, কস্তুরী মৃগ, ভরাল, সেরু, লাল পাণ্ডা, বিন্টুরং প্রভৃতি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণের ভাল সময় হচ্ছে আগস্ট থেকে অক্টোবর ও এপ্রিল-মে। বনবিভাগের চারটি বিশ্রামাগার রয়েছে। ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণ ও রাত্রিবাসের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ওয়াইল্ডলাইফ, সিকিম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, দেওরালি, সিকিম 737102-এর সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজনীয়। নিকটবর্তী বিমান বন্দর অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা।

হরিয়ানা

সুলতানপুরের ঝিল

দিল্লির 48 কিলো মিটার দূরে হরিয়ানা রাজ্যের সুলতানের শহরে যে জলাভূমি আছে, তা আকর্ষণ করে অসংখ্য পরিযায়ী ও নানান জাতের জলার পাখিকে। 1971 সালে জলাভূমিটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে পরিণত করা হয় এক বিশাল ঝিল-এ। পরবর্তীকালে রাজ্য পর্যটন-বিভাগ ঝিলটির আরো পুনর্বিন্যাস করে ফলে বর্তমানে ঝিলটির পর্যটন সীমা এক বর্গ কিলো মিটার মতো।

যে সমস্ত জলার পাখি এখানে সারা বছরই দেখা যায়, তারা হল জল পায়রা ও কায়েম পাখি (Common and Purple Moorhen), ডাহুক (White Breasted Waterhen), জলপিপি (Bronze Winged Jacana), হট্টিটি (Red Wattled Lapwing), খুদে বাটন (Little Ringed plover) প্রভৃতি। শাখা ও গাছের পাখির মধ্যে এখানে সন্ধান পাওয়া যাবে রামগাংরা (Grey Tit), রেন্ ওয়ার্বালার (Wren Warbler), বাবুই (Baya), বাবুনাই (White Eye) এবং নানান জাতের মৌচুষি পাখি (Sun Bird) প্রভৃতি। তবে সুলতানপুর ঝিলের সবথেকে বড় আকর্ষণ শীতের পরিযায়ী পাখির ঝাঁক। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এখানে উড়ে আসে সরাল (Lesser Whistling Teal), বড় দিঘর (Pintail), নীলশির (Mallard), রাঙামুড়ি (Pochard), খুন্তে হাঁস (Shoveller), রাজহাঁস (Greylag Goose) প্রভৃতি হাঁসেরা।

হরিয়ানার পর্যটন বিভাগের আনুকূল্যে এখানে গড়ে উঠেছে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাংলো। ডিরেক্টর, হরিয়ানা রাজ্য পর্য্যটন নিগমের কাছ থেকে এখানে থাকবার অনুমতি পাওয়া যাবে।

হিমাচল প্রদেশ

গ্রেট হিমালয়ান জাতীয় উদ্যান

কুলু শহরের 60 কিলো মিটার দক্ষিণ-পূর্বে সাইঞ্জ ও তির্থান উপত্যকায় 1739 বর্গ কিলো মিটার এলাকা ঘিরে 1984 সালে ঘোষিত হয় গ্রেট হিমালয়ান জাতীয় উদ্যান। এই জঙ্গলে রয়েছে চিতল, চৌশিঙ্গা প্রভৃতি, এছাড়া নানান প্রজাতির ফেজেন্ট ও শাখার পাখির দেখা মেলে।

এখানে বন্যপ্রাণী ও পাখি দেখবার জন্য যেতে হবে এপ্রিল ও মে এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।

এই জাতীয় উদ্যানে থাকবার জন্যে রেস্ট হাউস আছে। আশেপাশে খাবার দোকানও আছে। যোগাযোগ করতে হবে, ডি. এল. ও. (ডব্লু. এল) কুলু, হিমাচল প্রদেশ।

কানাওয়ের অভয়ারণ্য

1954 সালে 6 বর্গ কিলোমিটার মিশ্র জঙ্গল নিয়ে মনিকরণের 8 কিলো মিটার দূরে ঘোষিত হয় কানাওয়ের অভয়ারণ্য। পার্বতী নদীর উত্তর পাড়ে কুলু শহরের 35 কিলোমিটার দূরে এই বনভূমি।

এই সরলবর্গীয় বনভূমির প্রধান গাছগুলি হল ওক্, দেবদারু, পাইন প্রভৃতি। এই জঙ্গল থাকে থাকে উঠে গেছে 5.900 ফিট্ থেকে 15.856 ফিট্ পর্যন্ত।

এই অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির হিমালয়ের বন্যপ্রাণীর সন্ধান মেলে। উল্লেখযোগ্য প্রাণীর মধ্যে আছে হিমালয়ের, গোরাল (Goral) ও পাখির মধ্যে মোনাল ফেজেন্ট (Monal Pheasant)।

দারানঘাটি অভয়ারণ্য

সিমলা শহর থেকে 160 কিলো মিটার এবং রামপুর থেকে 60 কিলো মিটার দূরে 1974 সালে 167 বর্গ কিলো মিটার বনভূমি নিয়ে স্থাপিত হয় "দারানঘাটি" অভয়ারণ্য।

সরলবর্গীয় গাছের এই জঙ্গলে দেখা যায় চিতাবাঘ, হিমালয়ের সিভেট্, ভাল্লুক, গোরাল, কস্তুরি হরিণ প্রভৃতি বন্যপ্রাণী।

দারানঘাটির পাখির মধ্যে তিন ধরনের ফেজেন্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এরা হল মোনাল (Monal), কালিজ (Kalij), ও কোক্লাস (Koklas) প্রভৃতি।

এই জঙ্গলে আসবার শ্রেষ্ঠ সময় এপ্রিল থেকে জুলাই আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস।

সিম্‌লা থেকে বাসে করে রামপুর এসে দারানঘাটি আসা যায় বাসে বা জিপে।

এখানে চারটি বিশ্রাম গৃহ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা, চিফ্ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন, সিম্‌লা, হিমাচল প্রদেশ।

গোবিন্দসাগর অভয়ারণ্য

গোবিন্দসাগর জলাশয়কে কেন্দ্র করে 100 বর্গকিলো মিটার জলাভূমি নিয়ে 1974 সালে ঘোষিত হয় গোবিন্দসাগর অভয়ারণ্য। এখানে প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীলশির (Mallard), খুন্তে হাঁস (Shoveller), বালিহাঁস (Cotton Teal), বড় সরাল (Large Whistling Teal) ইত্যাদি।

চন্ডীগড় থেকে বাসে আসতে হবে বিলাসপুর। বিলাসপুর থেকে গোবিন্দ সাগর 6 কিলো মিটার।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে এখানে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়।

গোবিন্দসাগর অভয়ারণ্যে 5টি বিশ্রাম গৃহ আছে।

যোগাযোগ করতে হবে, চিফ্ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ারডেন, সিম্‌লা, হিমাচল প্রদেশ।

অরণ্য পর্যটকদের কর্তব্য

যে কোন জঙ্গলে বেড়াতে গেলে পর্যটকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার :—

- সবুজ বা খাঁকী পোষাক পরা উচিত যাতে, প্রকৃতির সবুজের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়।
- ভ্রমণকালে ধূমপান করা উচিত নয়। এইসব উগ্র গন্ধে অরণ্যের নিজস্ব গন্ধ ঢাকা পড়ে যায়। তাছাড়া জঙ্গলে আগুন লাগার সম্ভাবনাও থাকে।
- চকোলেট বা খাদ্য দ্রব্যের চকচকে রাংতার মোড়ক যাতায়াতের রাস্তায় ফেলা ঠিক নয়। জঙ্গলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে এরা বিঘ্ন ঘটাতে পারে।
- পলিব্যাগ বা প্লাস্টিকের জলের বোতল জঙ্গলে ফেলা উচিত নয়। কারণ এগুলি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায় না (নন-বায়োডিগ্রেডেবল্)।
- ম্যালেরিয়ার ওষুধ ও মশা তাড়াবার ধূপ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের দেশের বেশিরভাগ জঙ্গলই ম্যালেরিয়াপ্রবণ।
- বর্ষাকালে জঙ্গলে বেড়াবার সময় জোঁকের প্রতিষেধক হিসাবে নুনের পুঁটলি ও তামাক পাতা রাখা উচিত।
- পোকামাকড় বা বিছের কামড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য চটি নয়, জুতো পরে জঙ্গলে ঘোরা উচিত।
- পায়ে হেঁটে ঘোরবার সময় বন্যজন্তুর গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।
- জঙ্গলে টেপরেকর্ডার বা রেডিও বাজিয়ে বন্যজন্তুকে বিরক্ত করা উচিত নয়।
- বন্যজন্তুর দেখা পেতে হলে চলার পথে কথা না বলাই ভাল।

গ্রন্থপঞ্জি

A. S. Khati	• National Parks *Pelican Creations*
APA Production	• Insight Guides of Indian Wildlife, Srilanka and Nepal
Baker and Samuel	• Fauna of British India *Zoological Survey of India*
Bingham, CT	• Fauna of British India *Zoological Survey of India*
Das P. K. and Chakroborty S	• Rare and Endangered Animals of India *Zoological Survey of India*
Gee, EP	The Wildlife of India *Harpercollins Publishers India*
Lal J. B.	• Indias Forest *Natraj Publishers*
Majupuria T. C	• Wildlife Wealth of India *Wildlife Institute of India*
Mountfort, Guy	• Wild India *Collins U.K.*
Manfredi, Paola in Danger	• Ranthambhore Foundation
Prater S. H.	• The Book of Indian Animals *Bombay Natural History Society*
Saharia V. B	• Wildlife in India *Natraj Publishers*
Tikadar, B. K.	• Threatened Animals of India *Zoological Survey of India*
Biswajit Roy Chowdhury, Buroshiva Das Gupta and Indira Bhattacharyya	• The National Parks and Other Wild Places of India and Nepal *New Holland Publishers Ltd.*